আওয়ামী রাজনীতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

কার্তিক ঠাকুর

[illegible]

আওয়ামী রাজনীতি
ও
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

কার্তিক ঠাকুর

সৃজনী
৩৮/২ক, বাংলা বাজার ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশকাল ❑ ২০০৪
স্বত্ব ❑ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক ❑
নাফিজুল ইসলাম/সৃজনী ৩৮/২ক ৪র্থ তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ❑ নাসিম আহমেদ
কম্পোজ ❑ ঈশিন কম্পিউটার, পারগেন্ডারিয়া
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ মোবাইল, ০১৭১-০৪৫৫৮৩
মুদ্রণ ❑
সালমানী মুদ্রণ নয়াবাজার, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র।

Awami Rajniti O Songkhalogu Somproday : by Kartic Thakur First Published 2004 by Nafizul Islam Srejony. 38/2K. Banglabazar Dhaka-1100. Cover Design Nasim Ahmem.

Price : Tk. 70 only

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বই লিখলেই তার একটা ভূমিকাও লিখতে হয়। কিন্তু বই লেখা যতটা সহজ ভূমিকা লেখা তত সহজ নয়। কারণ ভূমিকা হচ্ছে গোটা বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য যা বক্তব্যকে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা অর্থাৎ একশত পৃষ্ঠার একটা বইয়ের মূল বিষয়কে এক পৃষ্ঠারও কম পরিসরে পরিবেশন করাই ভূমিকা। তবে আমার এ বইয়ের ভূমিকা লেখা তত কঠিন নয়, কারণ বইয়ের নামের মধ্যে দিয়েই মূল বক্তব্যের প্রায় পুরোটাই প্রকাশ পেয়েছে।

আমি নেশা এবং পেশা উভয়েই একজন রাজনীতিক। তবে আমার এ রাজনীতির লক্ষ্য খুবই সীমিত। এদেশের জনসংখ্যার এক দশমাংশ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নতি বিধানের পথকে একটু প্রশস্ত করাই আমার রাজনীতির সীমিত লক্ষ্য।

এ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় আমি আমার ৩৫ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেতৃর সান্নিধ্যে এসেছি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও লিপ্ত হয়েছি। এ সবের মধ্যদিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতায় আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, আজ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় যে সব সমস্যা যথা রাজনৈতিক অংগন ও সামাজিক জীবনে যথাক্রমে প্রতিনিধিত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা এবং তারই ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ও শৈক্ষিক জীবনে পর্যুদস্ত অবস্থার সম্মুখীন, তার জন্য সামগ্রিকভাবে আওয়ামী লীগই দায়ী।

বিস্ময়কর বাস্তবতা হল যে সব কারণে হিন্দু জনগোষ্ঠি আজ অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত আওয়ামী লীগ তার প্রায় সবগুলোর স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এখনো আওয়ামী লীগকেই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মনে করে, ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। আমি এই বইয়ের নিবন্ধগুলোতে হিন্দু সম্প্রদায়ের এই আওয়ামী প্রীতির কারণ এবং সেই সাথে তাদের প্রতি আওয়ামী লীগের পর্যায়ক্রমিক প্রতারণার রূপ ও স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচার পাঠকের।

আমার রাজনৈতিক সহযোগী অধ্যক্ষ গনেশ হালদারের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ক্রমাগত তাগিদে গত ক বছরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা নিবন্ধগুলো আমার ফাইলে বন্দি হয়েই ছিল। সম্ভবত এগুলো ওভাবেই থাকতো, যদিনা বিশিষ্ট সমাজসেবী দানবীর শ্রী রনবীর রায় চৌধুরীর দৃষ্টি এদিকে পড়তো। তাঁর ইচ্ছা, সহযোগিতা এবং সাহায্যেই এগুলো দুই মলাটের মধ্যে বন্দি হয়ে

www.pathagar.com

পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর সুযোগ পেল। নিজের সামাজিক দায়িত্ব বোধই তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাকে ছোট করবো না।

বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন স্বল্প পরিচিত কিন্তু-অকৃত্রিম বন্ধু জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস।

আমার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনদের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাকে যারা রাজনীতি চর্চা ও লেখা পড়ার অখণ্ড অবসর ও সুযোগ দিয়েছে লক্ষন ও ভরত প্রতিম আমার সেই দুই অনুজ নেপাল ও গোপালের কথা বইটি প্রকাশের মুহূর্তে খুব বেশী করে মনে পড়লেও তারা আমার সত্ত্বার অপরিহার্য অংগ বিধায় তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না।

পরিশেষে বইটি পাঠ করে পাঠকদের একটি সামান্য অংশও যদি নির্দোষ দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করার প্রেরণা লাভ করে তবে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

–লেখক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আওয়ামী লীগই হিন্দুদের সমস্যার জন্য দায়ী/৭
আওয়ামী লীগের টার্গেট হিন্দুদের আধিপত্য বিনাশ/১২
হিন্দুদের বাঙালিত্বের বাঁধা কোথায়/১৯
অবিশ্বাসের টানাপোড়নে হিন্দু সম্প্রদায়/২৩
আইয়ুব খাঁন নয়, শেখ মুজিবই শত্রু সম্পত্তি আইনের স্রষ্টা/৩১
শত্রু সম্পত্তি আইন নিয়ে ধোকাবাজি/৩৭
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ একটি আওয়ামী প্রতারণা/৪২
সাংবিধানিকভাবেই হিন্দুরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক/৪৭
সংখ্যালঘুদের উপর সাংবিধানিক নির্যাতন/৫৩
কালিদাস বড়ালের হত্যা সংখ্যালঘুদের জন্য অশনি সংকেত/৬৯
বিশেষ সাক্ষাতকারে তফসিলি নেতা কার্তিক-গনেশ আ'লীগ ছাড়া অন্য দলগুলো হিন্দুদের ভোট নিতে জানে ন/৭৩
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শহীদ জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর/৮১
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লগির গাত্রদাহ/৮৬
বেগম খালেদা জিয়া কেন যেতে পারলেন না বানিয়ারচরে/৯০
হাসিনা-অমর্ত্য সেনের ডক্টরেট ঃ কে উত্তম কে অধম/৯৩

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পিতার পদ কমলে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগই হিন্দুদের সমস্যার জন্য দায়ী

গত ২৫ ডিসেম্বর '৯৯-এ প্রভূ জগবন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ প্রাঙ্গণে সনাতন ধর্মের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত এ সম্মেলনে যেসব প্রখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিথ ছিলেন তাদেরকে যদি বর্তমান বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সকল স্তরের প্রতিভু বা প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় তবে সেটাও নেহায়েত অত্যুক্তি হবে না। এছাড়াও এ সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস, এ, মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের মর্যাদা ও গুরুত্ব দুই-ই বৃদ্ধি করেছেন।

ইদানিংকালে অনুষ্ঠিত সব সংখ্যালঘু সম্মেলন বিশেষ করে হিন্দু সম্মেলনসমূহের ন্যায় এ সম্মেলনের বক্তারাও ধর্মীয় বিষয়সমূহের আলোচনার পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যারও আলোচনা করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ধর্মীয় অধিকার বা স্বাধীনতা সব সময়েই রাজনৈতিক অধিকারের উপর নির্ভরশীল। যখনই কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তখনই তার ধর্মীয় অধিকার এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশও বাঁধাগ্রস্ত হয়। সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলনে নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন এবং তা সমাধানের যে আশু দাবি উত্থাপন করেছেন, বহুল আলোচিত এ সমস্ত সমস্যা এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনের সাথে এমন অতোপ্রতোভাবে জড়িত যে সব সমস্যার আলোচনা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ধর্মীয় আলোচনা সম্মেলনের কোন স্বার্থকতা বহন করতো না।

এ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত সমস্যা উত্থাপন করেছেন এবং ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে তার সমাধান দাবি করেছেন সে সব সমস্যার প্রায় সবগুলোই বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ঊষালগ্ন, সেই '৭২ সাল থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে এবং এসব সমস্যা সমাধানের দাবি তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারসহ পরবর্তীকালে সকল সরকারের কাছেই উত্থাপিত হয়েছে। তবে বেদনাদায়ক ও কঠিন বাস্তবতা হলো স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন সকল সরকারই এসব সমস্যার সমাধানের কম বেশি আশ্বাস দিলেও সমস্যাগুলো প্রায় তিন দশক অর্থাৎ সেই বাহাত্তর সালে যে স্তরে ছিল-কেবল যে সেই স্তরেই রয়ে আছে তাই নয়, এর মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে এবং এসব সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত আরো নতুন অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী এসব সমস্যা আজ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও আজ তাই প্রশ্ন উঠেছে

www.pathagar.com

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জাতীয়তা, নাগরিকত্ব এবং দেশপ্রেম নিয়েও এবং তা উঠেছে স্বয়ং সরকার প্রধানের তরফ থেকেই। কিন্তু যাক সে কথা, আলোচ্য সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ এমন একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন যা একাধারে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও বেদনারও কারণ। সম্মেলনের বক্তারা বলেছেন, স্বাধীনতার তিন দশক পরেও এদেশ থেকে অন্যায়, অবিচার, অবিশ্বাস আর বৈষম্যের শিকার হয়ে প্রতিদিন ৫৫০ জন সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ডিসেম্বর মাস ১২ কোটি বাঙালির নবজাগৃতি, উদ্দীপনার মাস। সীমাহীন ব্যাথা-বেদনা আর শোক সন্তানের সাথে সাথে অন্তহীন আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, আর সাহসের মাস এই ডিসেম্বর। ১৯৭১'র ১৬ ডিসেম্বরে ৯ মাসব্যাপী মুক্তি সংগ্রামের সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাক হানাদার বাহিনী আর তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামসদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারানো যে এক কোটি মানুষ ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও এ মাসেই দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, বুকে অনন্ত আশা, চোখে সোনালী স্বপ্ন, আর মনে অদম্য উৎসাহ ও বিশ্বাস নিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহের আশ্রয় নেয়া নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা সেদিনের সেই মানুষগুলোর প্রায় সকলেই যে ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়যুক্ত একথা আজ অনেকে অস্বীকার করার প্রয়াস পেলেও সেটা এক ঐতিহাসিক সত্য।

স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা, মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রখ্যাত নিবন্ধকার শাহরিয়ার কবির সম্প্রতি এক নিবন্ধে বলেছেন–"একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি সাধারণ বাঙালীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শিকার হলেও হিন্দু তথা নব অভিধানে অভিহিত মালাউনরাই ছিল তাদের নির্যাতনের ঘোষিত লক্ষ্য"। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রার্থনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সমীপে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেও তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকবাহিনীর অত্যাচার এবং তার ফলে তাদের দেশত্যাগের কথা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারও কি এ সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন কোন কর্মপন্থা। যতদূর জানি কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করতো দূরের কথা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোন সরকারই হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কারণসমূহই এখনও চিহ্নিত করেনি-যদিও কোন সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণই হচ্ছে সে সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ।

সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি-দাওয়াগুলো মেনে নেয়া। এক্ষেত্রে তারা অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল, দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া, রমনায় কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা, ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে বিধ্বস্ত মন্দিরগুলোর সংস্কার এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ফাউণ্ডেশন গঠনের জন্য দাবি জানিয়েছেন। এসব সমস্যা যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনের একান্ত জ্বলন্ত সমস্যা তা অনস্বীকার্য, তবে এসব সমস্যার সাথে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের বিষয়টি কতোটা কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত তা বিতর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু সে বিতর্কে যাওয়ার আগে দেখা দরকার উত্থাপিত সমস্যাগুলো কবে, কিভাবে, কার বা কাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তিন যুগ ধরে জগদ্বল পাথরের মতো চেপে বসা, সকল মহল কর্তৃক কালো আইন হিসেবে চিহ্নিত, সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনটির কথাটাই প্রথম আলোচনা করা যাক।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে জারিকৃত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ (Defence of pakistan Ordinance 1965 (XXIII 1965)-এর আওতায় যুদ্ধরত ভারতের নাগরিকদের শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়। অতঃপর এ অধ্যাদেশটি বারবার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রয়োগ-অপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে পর্যুদস্ত ও ধ্বংস করার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে সমস্ত পাকিস্তান আমল জুড়েই। বস্তুত ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কয়েক লাখ হিন্দুর দেশ ত্যাগের প্রধানতম কারণ হিসেবে এই শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশটিকেই দায়ী করেছেন সমকালীন অনেক গবেষক। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পর স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে এই চরম সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, সামাজিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক নির্যাতনমূলক আইনটির যে স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটবে সে আশা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সকল মানুষেরই। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে স্বাধীনতার উষালগ্নে ১৯৭২ সালে ২৫ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের আদেশ নং ২৯ দ্বারা মৃত এই আইনটিকে পুনর্জীবিত করলেন নিম্নবর্ণিত ভাষায়।

2. (1) Not with standing anything contained in any other law for the time being in force, all properities and assets which were vested in the Government of Pakistan or were vested in or managed by any Board constitued by or under any law or in the former Government or East Pakistan shall be deemed to have vested in the Government of Bangladesh on and from the 26 the day of March 1971.

[President Order No, 29 or 1972, Bangladesh (vesting of property and Assets) Order 1972)]

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সকল আবেদন, নিবেদন, বাদ-প্রতিবাদ ও অনুরোধ উপরোধকে উপেক্ষা করে সংখ্যালঘু দরদী শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সরকার এই অধ্যাদেশটিকে সংসদীয় আইনে পরিণত করে তার ভিত্তিমূলকে আরো পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় করলেন।

এইভাবে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনটি আওয়ামী লীগ কর্তৃক পাকাপোক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিগত দিনগুলোতে হিন্দু সম্প্রদায় এই আশা পোষণ করেছে যে, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ কোনদিন ক্ষমতায় এলে, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক এই আইনটি অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে, তাই ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন (তাদের প্রায় একচেটিয়া ভোট পেয়ে) ক্ষমতায় এলো তখন হিন্দুরা শুধু আশাই করলো না, বিশ্বাসও করলো যে, এবার আইনটি অবশ্যই পুরোপুরিভাবে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইতোমধ্যে আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ তার শাসনকালের প্রায় প্রান্ত সীমায় এসে গেলেও আইনটি বাতিল না করে তা সংস্কারের নামে নানা আলোচনা, সমালোচনা ও কমিটি উপ-কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কেবল কালক্ষেপণই করে চলেছে এবং ইতোমধ্যে এই আইন সংস্কারের যে খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাতে এ আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের কতোটুকু উপকার হবে তা নিয়েও নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

সনাতন ধর্ম সম্মেলন থেকে রমনা কালী বাড়ি প্রতিষ্ঠার যে দ্বিতীয় দাবিটি উত্থাপিত হয়েছে, তাকে অভিহিত করা যায় বাংলাদেশের ২ কোটির মতো হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়ের নিত্য রক্ত ঝরানো এক দীর্ঘ ক্ষত হিসেবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই বিভীষিকাময় কালো রাতে পাক বাহিনী কামানের গোলায় গুড়িয়ে দিয়েছিল ৫শ বছরের পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণ প্রদীপসম এ মন্দিরটিকে-সেই সাথে হত্যা করেছিল মন্দির চত্বরে অবস্থানরত শতাধিক ভক্ত-পূজারীদের। স্বাধীনতার পর ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হবে হিন্দুদের এ বিশ্বাস ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয়নি। হিন্দু-সম্প্রদায়ের সকল আবেদন, নিবেদন ও প্রার্থনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৩ মে তারিখে বুলডোজার দিয়ে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটুকুও ধুলিসাৎ করে দিয়ে মন্দিরের নামে দেবোত্তরকৃত সকল সম্পত্তিকে অধিগ্রহণ করে তাকে পরিণত করলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আওয়ামী লীগ সরকারের এই কাণ্ড দেখে বাংলাদেশের ২ কোটি বিক্ষুব্ধ, বিমূঢ় বেদনাতুর হিন্দু সম্প্রদায় সেদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির উপেনের মতো–"এ জগতে হায় সেই বেশী চায় যার আছে ভুরি ভুরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরিঃ পংতি দু'টি উচ্চারণের বেশি আর কিছু করতে পারেনি।

১৯৯২ সালে ভারতের চরম সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর শিখ সেনারা অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেদিন সে ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ভারতের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ বহু রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এবং সে প্রতিবাদ আজও অব্যাহত আছে। কিন্তু রমনা কালী বাড়িকে সমতল ভূমিতে পরিণত করে, তাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রূপান্তরিত করার প্রতিবাদ এদেশের কোন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবি মহলসহ কোন রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রী কেউ করেছেন বলে মনে পড়ছে না।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পাক বাহিনী কর্তৃক রমনা কালী বাড়ি ধ্বংস করার সংবাদ অবহিত হওয়ার পর জল্লাদ ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং মন্দির মেরামতের জন্য ৩ লাখ টাকা অনুদানও দেয়া হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের উপসচিব (অর্থ) কে, বি রায় চৌধুরীর স্বাক্ষরে বরাদ্দকৃত সে টাকা প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠানোও হয়েছিল।

রমনা কালী বাড়ী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিণত হওয়ার দুই যুগ পরে আবার ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ এবং তাদের এ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে রয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিশেষ অবদান। আজ তাই সনাতন ধর্ম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ যখন আওয়ামী লীগ সরকারেরই প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার উপস্থিতিতে রমনা কালী বাড়ি পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায় তখন স্বাভাবিকভাবেই যেমন মনে ইতিবাচক আশা জাগে, তেমনি প্রশ্নও জাগে-যাদের হাত দিয়ে এটা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রূপান্তরিত

www.pathagar.com

হয়েছে তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রধানের মনে কি এ দাবি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে?

জগবন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে দাবি করা হয়েছে হিন্দু ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠারও। এটিও প্রায় দুই যুগের পুরনো দাবি। ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ইতোপূর্বে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে পুনর্গঠন করেন তখনই অন্য তিন সম্প্রদায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ঠানদের জন্যও অনুরূপ ফাউণ্ডেশন গঠনের দাবি উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। ধর্ম নিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সেদিন সে দাবির প্রতি কোন কর্ণপাতই করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদ কর্তৃক গঠিত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যগণ বিগত ১৯৯৮ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে উক্ত কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউণ্ডেশনে রূপান্তরের দাবি জানিয়ে একইভাবে নিরাশ ও প্রত্যাখিত হয়েছেন। এখানে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, এরশাদ কর্তৃক ৩ কোটি টাকার আমানত নিয়ে গঠিত এ ট্রাস্টের তহবিলকে বেগম খালেদা জিয়া তার শাসনকালে ৭ কোটি টাকায় উন্নীত করার পর সে তহবিলে আর একটি টাকাও প্রদান করা হয়নি আওয়ামী সরকারের গত চার বছরে। পরিশেষে বলতে চাই, সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলনের নেতৃবৃন্দের আজ যেসব সমস্যাগুলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে হতাশা সৃষ্টি ও তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে তার সমাধান দাবি করছেন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে সে সব সমস্যার সবগুলোরই স্রষ্টা অতীতের আওয়ামী লীগ সরকারই। এসব সমস্যার শিকার মানুষগুলোর মনে তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যে সমস্যার স্রষ্টা অতীতের আওয়ামী লীগ, সে সমস্যার সমাধান কি বর্তমানের আওয়ামী লীগ দিতে পারবে, না দেবে না।

অতঃপর মহাকাব্য রামায়নের ছোট্ট একটি কাহিনি বলেই আমি এ নিবন্ধের ইতি টানবো।

একদা এক নির্জন অপরাহ্নে স্রোতস্বিনী সরজুর কুলে জ্যামুক্ত ধুনক বাঁশের এক প্রান্তে বালুতে প্রোথিত করে অন্য প্রান্তে চিবুক ঠেকিয়ে অনেকটা অন্যমনষ্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন অযোধ্যাপতি রঘুপতি রাঘব রাজারাম। অন্যমনষ্কতা কেটে যাওয়ার পর তিনি শ্রবণ করলেন ধনুকের অন্য প্রান্তে বিদ্ধ কোন প্রাণীর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি। ত্বরিতে ধনুক বাঁশ উত্তোলন করে দেখলেন ধনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রদেশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক বৃদ্ধ ভেক। রামচন্দ্র ভেকটিকে জিজ্ঞাসা করলো–'কোন জীব যদি মৃত্যুকালে রামনাম যপ করে তাহলে সে পরলোকে অনন্ত স্বর্গ লাভ করে সে কি তা জানে না?' মৃত্যুপথ যাত্রী যন্ত্রণাকাতর ভেকটি উত্তর দিলো–'মৃত্যুকালে রামনাম যপ করলে জীবের অনন্ত স্বর্গ লাভ হয় তা সে জানে এবং সেই সাথে সে এটাও জানে যে, যার ধনুকে বিদ্ধ হয়ে সে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র। তারপর সেই বৃদ্ধ ভেক প্রশ্ন করলো প্রভু আপনি স্বয়ংই যখন আমার হত্যাকারী, তখন আপনার নাম যপ করে আমার স্বর্গ লাভের কোন সম্ভাবনা আছে কি? জীবনের শেষ মুহূর্তে ভেকটির এ প্রশ্নে রামচন্দ্র কি উত্তর দিয়েছিলেন–সেটি অবশ্য আমার জানা নাই।

www.pathagar.com

আ'লীগের টার্গেট
হিন্দুদের আধিপত্য বিনাশ

নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাই হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের দলগত অবস্থানের মাপকাঠি। এ আলোকে বিচার করলে আওয়ামী লীগই আমাদের দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। গত '৯৬-এর নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ শতকরা ৩৭.৪৪, বিএনপি ৩৩.৬১, জাতীয় পার্টি ১৬,৪১ এবং জামাতে ইসলামী শতকরা ৮.৬১ ভোট পেয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী এই চারটি দলের মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগই কাগজে-কলমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তবে সৃষ্টিলগ্নে কিন্তু আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেনি। গঠন লগ্নের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে সেটা হয়তো সম্ভবও ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ১ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুকে পাকিস্তানের আন্দোলনের একক নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাশ লোলুপোতা এতো বৃদ্ধি পায় যে তার ফলে দলটি অতি অল্পকালের মধ্যেই তার জনপ্রিয়তা হারায় এবং ক্রমাগতভাবে জনবিচ্ছিন্ন ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ গ্রহণ করতে থাকে।

এই পেক্ষাপটে জাতীয় নেতৃবৃন্দ, যথা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পাকিস্তান আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তারা সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালের ২৩/২৪ জুন তারিখে এক সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সব রকম নিয়মনীতিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে যখন তখন সরকারের রদবদল, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডব, পর্যায়ক্রমিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অযৌক্তিক জেদ প্রভৃতি কারণে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ অতি দ্রুতগতিতে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ এ পরিস্থিতিতে ইতিবাচক আন্দোলন ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সমর্থন লাভ করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও পাকিস্তান কৃষক প্রজা পার্টির প্রেসিডেন্ট এ, কে, ফজলুল হক এই দুই দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত এই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২২টি আসন লাভ করে

www.pathagar.com

এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি আসন। বস্তুত এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সমাধী রচিত হয়ে যায়। এই নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় ৩০৯ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৭২টি তথা প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসন লাভ। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের কোন স্থিতিশীল সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়কে সুনজরে দেখেনি। তাই শুরু থেকেই কেন্দ্রিয় সরকার যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সরকারের স্থিতিশীলতা বিনাসের প্রয়াস পায়। এ ক্ষেত্রে দলীয় কোন্দল, সদস্যদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও লোভ এবং সে কারণে ক্রমাগত রাজনৈতিক ডিগবাজি কেন্দ্রিয় সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়ক হয়।

আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই পরিষদের প্রায় এক চতুর্থাংশ সদস্য ছিলেন সংখ্যালঘুর উপস্থিতি সংখ্যাগুরু রাজনৈতিকদলসমূহের অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। বিশেষ করে পরিষদ সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ একটা নিয়ামক শক্তি হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করায় সংখ্যাগুরু দলগুলোর উষ্মা আরো বৃদ্ধি পায়। বস্তুত সরকারের উত্থান-পতন ও ভাঙ্গা গড়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সরকারের স্থায়ীত্ব বা স্থিতিশীলতা। আওয়ামী লীগের কাছে সংখ্যালঘু সদস্যদের এই নিয়ামক ক্ষমতা বিশেষ বিরক্তিকর বলেই মনে হচ্ছিল এবং এ অবস্থা তথা সংখ্যালঘুদের এই আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতির একটা উপায় তারা খুঁজছিলেন এবং পৃথক নির্বাচন বাতিল করে অবিমিশ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনই ছিল এর একমাত্র পথ। এ লক্ষ্যে তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল তাদের দল আওয়ামী লীগকে অন্তত কাগজে-কলমে হলেও একটি অসাম্প্রদায়িক দলে রূপান্তরিত করার এবং এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তাদের দলে স্থান করে দিয়ে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধন এবং এভাবেই তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিনাশ ঘটানো।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের ২৫ আগস্ট এক কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি হোসেন সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে সংগঠনের গঠনতন্ত্র থেকে মুসলিম শব্দটিকে বাদ দিয়ে সংগঠনটিকে এক অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করে। এ সম্পর্কে পরদিন দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার-এর রিপোর্টে বলা হয়–"This is the first time a political party, dominated by Muslims and of a considerable significance in the political life of the country has decided to throw its doors open to members of all communitees residing in pakistan. The party will now known as Eass Pakistan Awami-League and any citizen of Pakistan above 18 years of age. Who signs a pledge of allegiance to the aims and object of

www.pathagar.com

the organisation and pays its membership fee is now eligible for its membership. এভাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ রূপান্তরিত হলো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে-তার সদস্য হওয়ার দরজা খুলে দেয়া হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য। আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার কয়েক মাস পরেই পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত না করে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে সে দেশে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার পক্ষে মত দান করলেও জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে এ নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দু সদস্যরা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দল পৃথক নির্বাচন প্রথা গ্রহণের পক্ষে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা অবিমিশ্র যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে অনুন্নত অনগ্রসর তফসিলী সম্পদ্রায়সমূহের জন্য আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে মত দেয়।

আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল সংখ্যক হিন্দু সদস্যের উপস্থিতি আওয়ামী লীগের দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বস্তুত কোনরূপ মহৎ আদর্শ যথা এক জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় সংস্কৃতি বোধের উজ্জীবন নয় বরং পরিষদকে হিন্দু আধিপত্যমুক্ত করার লক্ষ্যে যুক্ত নির্বাচন প্রস্তুতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শদীহ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন প্রথার স্বপক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ করলেই আমার এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার বক্তৃতায় বলেন "পশ্চিম পাকিস্তানের অমুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য, কাজেই আমরা সেখানে যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করি বা পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করি তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত ত্রাণ কর্তাগণ যে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের যেখানে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু আছে তার ফলাফলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। খুলনা জেলায় হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় সমান। এই জেলা হইতে প্রাদেশিক পরিষদে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ৮ জন মুসলমান ও ৭ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হন। অথচ খুলনা জেলা বোর্ডে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সেখানে এই অনুপাত মোট ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা, সেখানে ২৮ জন মুসলমান এবং মাত্র ২ জন হিন্দু নির্বাচিত হইয়াছেন। ফরিদপুর জেলা বোর্ডে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্বাচন হইলে ২৫ জন মুসলমান ও ১১ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হইতেন। তথায় যুক্ত নির্বাচনের ফলে ৩২ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দু নির্বাচিত হইয়াছেন। দিনাজপুর জেলায় হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় জেলা বোর্ডে ১২ জন মুসলমান ও ৯ জন

www.pathagar.com

হিন্দু নির্বাচিত হওয়ার কথা অথচ তথায় ২১ জনই মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমস্ত কথা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা না করে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ না করে তাহা হইলে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় তাদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রকৃতপক্ষে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে প্রতিনিধিত্বের দিক হতে ক্ষতি হইলে হইবে হিন্দুদের। কেহ কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন যে, প্রতিনিধিত্বের দিক হইতে হিন্দুদের যদি এতটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে তবে তারা যুক্ত নির্বাচিত সমর্থন করিতেছেন কেন? আমি আগেই তার কারণ দেখাইয়াছি, তবে আরও কারণ আছে, অবিভক্ত ভারতের নাগরিক রূপে যে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি মানে নাই, নিজেরা এখন সংখ্যালঘু হইয়া পড়ায় সেই একই দাবী তাহারা অগ্রাহ্য করিবে কিভাবে। আমি আরো বলিতে চাই যে, পৃথক নির্বাচন প্রধায় হিন্দুরা এতো বেশি সংখ্যক আসন লাভ করিবে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দলগুলোর মধ্যে তারা সর্বদাই ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করিবে। সংখ্যালঘুরা নিজেদের মধ্যকার সকল বিভেদ ভুলিয়া গিয়া ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করিবে, পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি লাগিয়াই থাকিবে। রাজনীতির ধারা এবং যুক্তির দিক হইতে ইহা অবশ্যম্ভবী।

আজ থেকে চার দশকেরও অধিককাল আগে বিশেষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বহীনতার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাংলাদেশে তা আজ এক বাস্তব সত্য। এই অবিমিশ্র যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার কল্যাণেই আজ জাতীয় সংসদসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ২ কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই প্রতিনিধিত্বহীন। বস্তুত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে গৃহিত যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা সারা পাকিস্তান আমল জুড়ে তো বটেই, স্বাধীন বাংলাদেশেও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এবং এর ফলেই ১৯৫৪ সালের পর আর এদেশের কি পাকিস্তান আমল, কি বাংরাদেশের ত্রিশ বছরের মধ্যে জাতীয় সংসদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ১৪ জনের (উপজাতিসহ) উপরে উন্নীত হয়নি, যদিও সংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা কম করে হলেও হওয়া উচিত ৩০ জনেরও উর্ধ্বে।

অবিমিশ্রি যুক্ত নির্বাচনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের মধ্যে পাস্পরিক ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এর অনুপস্থিতিতে অবিমিশ্র যুক্ত নির্বাচন সংখ্যালঘুদের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বহীন করবেই।

এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করলেও তার দলীয় আদর্শ হিসেবে ধমীনিরপেক্ষতাকে ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। বস্তুত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, তথা তার সাহায্য, সহযোগিতা এবং সর্বশেষ তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সফলতা অর্জন বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বার্তাবরণের সৃষ্টি করেছিল তার প্রেক্ষিতেই আওয়ামী লীগ অনেকটা অনিচ্ছায় ও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দলীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতির অন্যতম মুলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের সকল স্তরে এর প্রয়োগ ও

www.pathagar.com

অনুশীলনের জন্য যে আন্তরিকতা ও কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুকৌশলে তা থেকে বিরত থেকেছে। এমনকি যে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলে তারা দাবি করে–সেই বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের অনুশীলন ও বিকাশের ক্ষেত্রেও যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে তারা পুরোপুরি আন্তরিক হতে পারেনি।

অনেকে মনে করেছিল ত্রিশ লাখ মানুষের যে রক্ত সমুদ্রে স্নান হয়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যের অভ্যুদয়-সেই রক্ত সমুদ্রে অবশ্যই নিমজ্জিত হয়ে গেছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিত্ব। কিন্তু শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতার উষালগ্নে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিলেন তাতেই সে চিন্তায় প্রথম চিড় ধরলো।

সেদিনের সেই ভাষণে রমনা রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লাখ লাখ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক হলিডে লিখেছিল–

Shaikh Mujibur Rahman set his foot. In independet Bangladesh from his dungeon in Pakistan (on January 10. 1971) amidst tumultuous welcome by the people he had declared before the vast multitude at the Suwardy Uddyan that "Bangladesh is now the second largest Muslim country in the world after Indonesia". The freedom fighters were rudely jolted. Did they fight for creating another Muslim country or for secular Bangladesh? Did not the Pakistanis and their fundamentalist collaborators. Vociferously declared that their main objective was to save Islam. If Bangladesh is to lose its secular charector then what was the use of shedding so much blood in fighting against a theocratic fundamentalist state like Pakistan."

সুতরাং একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে লাখ লাখ মানুষ মৌলবাদী ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের কবল থেকে বেরিয়ে আসার জীবন-মরণ সংগ্রামে চরমতম ত্যাগ স্বীকারে পরানুখ হয়নি তাদের সেই স্বপ্নের সাথে যে শেখ মুজিবের লক্ষ্য ও আদর্শের মিল ছিল না বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথম ভাষণেই তিনি তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি শেখ মুজিবের আন্তরিকতা এবং রাষ্ট্রিয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে তার মনোভাবের কথা বলতে যেয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নিবন্ধকার গোলাম মুরশিদ বলেছেন, "পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে যে সংকেত দেখান তা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কোনদিন ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। তার পরিচয় ইসলামী না হলেও সে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্রঃ। (স্বরূপের সংকট–ভোরের কাগজ, ৬/৬/৯৭)

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আরো মন্তব্য করেছেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার জে, এন দীক্ষিত। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিয়ণ্ড লিবারেশনঃ ইন দ্য বাংলাদেশ রিলেশন' শীর্ষক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, এমন মূল্যায়নও শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমানের মধ্যে ছিল যে, নিজ দেশের স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরতে হলে বাংলাদেশকে কেবল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র্যকে তুলে ধরলেই হবে না, বাঙালি মুসলিম পরিচিতির বিষয়টিকেও একই সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশ যাতে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়, সে ব্যাপারে তার গভীর আগ্রহ ছিল।

এই আগ্রহের প্রাবল্যেই তিনি ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে কয়েকটি মুসলীম দেশের তৎপরতায় সকলকে অবাক করে দিয়ে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও যোগদান করনে দ্বিধাবোধ করেননি। ইসলামী রাষ্ট্রসংঘের এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশ লাভ করে ইসলামী রাষ্ট্র সংঘের সদস্যপদ। এই সদস্যপদ গ্রহণে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হলো কিনা? এটা রাষ্ট্রের অন্যতম মুলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ কিনা-এসব প্রশ্নের প্রতি সেদিন শেখ মুজিব কোন গুরুত্বই দেননি। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বিশেষ ধর্মীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হওয়া যে সোনার পাথর বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত হাস্যকর সেটা বোঝা বা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান, প্রজ্ঞা অবশ্যই শেখ মুজিবের ছিলো-তবুও তিনি এটা করেছিলেন বা করতে পেরেছিলেন-রাষ্ট্রীয় মুলনীতির অন্যতম নীতি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আন্তরিক ছিলেন না বলেই।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশকে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভূক্ত করেই শেখ মুজিব ক্ষ্যান্ত হয়নি। এর ধারাবাহিকতার পথ ধরে ১৯৭৫ সালে ২৫ মার্চ তারিখে তিনি ইতিপূর্বে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী ফাউণ্ডেশনকেও পূনর্জীবিত করলেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার, তথা ধর্ম যার যার-রাষ্ট্র সকলের; এই নীতির আলোকে গঠিত হলো না, হিন্দু বৌদ্ধ খিষ্টান ফাউণ্ডেশন যা আজও হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের এই দ্বিধাযুক্ত, অস্পষ্ট ও শিথিল দৃষ্টিভঙ্গীর পথ ধরেই বাংলাদেশে যাত্রা শুরু হলো ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির। সম্প্রতি জনৈক প্রথিতযশা সাংবাদিক এক নিবন্ধে লিখেছেন জেনারেল এরশাদের ৮ম সংশোধনী ছিল জেনারেল জিয়ার ৫ম সংশোধনীর অনিবার্য পরিণতি, তার এই বক্তব্যের অনুসিদ্ধান্তে বলতে হয় শেখ মুজিব কর্তৃক বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভূক্তকরণ, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গঠনের অনিবার্য পরিণতিই জেনারেল জিয়ার ৫ম সংশোধনী-যার মাধ্যমে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্য হওয়ার সাথে রাষ্ট্রের অন্যতম মুলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার অসঙ্গতি তথা বৈপরীত্বের সমাধান করেছিলেন। আর তারই যৌক্তিক পরিণতিতে এরশাদ করেছিলেন সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্ষরিক অর্থেই পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা দুই কোটি। আওয়ামী লীগের প্রধান ভোটদাতা তারাই। ৯৬ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কারণে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নজিরবিহীন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

সময়ও দেখেছি সাধারণভাবে বাঙালীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞের শিকার হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়কে অধিকতর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদের তালিকা যতটুকু সংগৃহিত হয়েছে তার ভিতর তুলনামূলকভাবে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। পাকিস্তান আমলে হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাদের গণ্য করা হয়েছে দেশের শত্রু হিসেবে; যার উৎকট নিদর্শন শত্রু সম্পত্তি আইন। এই হিন্দুদের প্রত্যাশা ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী পরিবর্তন করবে। সংসদে না পারলেও আদালতের কাছে অন্তত আওয়ামী লীগ জানতে চাইবে রাষ্ট্রের মুলনীতি কোন সামরিক শাসক পরিবর্তন করতে পারে কিনা। কোন গণতান্ত্রিক সরকারও পৃথিবীর কোন দেশে ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রের মূলনীতি বা চরিত্রের পরিবর্তন করার নজির স্থাপন করেনি। বাহাত্তরের সংবিধান প্রণেতারা একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশ স্বাধীন করে নতুন রাষ্ট্রের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন সে নীতি পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে নাকচ করে দেয়া। বাংলাদেশে তাই হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে গত সাড়ে চার বছরেও এ বিষয়ে কোন কথা বলেনি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সাড়ে চার বছরে একবারও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেনি। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহযোগিরা অহরহ বলছেন তারা ক্ষমতায় এসে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আগের চেয়ে কত বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছেন, মসজিদে মসজিদে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্য কতোসব কর্মসূচি নিচ্ছেন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এতোটুকুও পিছিয়ে ছিল না। পোষ্টারে দলের সভানেত্রীর ছবি ছাপা হয়েছিল মোনাজাতরত অবস্থায়-এই হচ্ছে আওয়ামী লীগের ধর্ম নিরপেক্ষতা।

এ নিবন্ধের শুরুতে আমি বলেছি, আমাদের দেশের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বকারী ৪ টি বড় দলের মধ্যে আওয়ামী লীগই কাগজে-কলমে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল। কিন্তু তাদের এই ধর্মনিরপেক্ষতা যে সত্যিই কাগজে ধর্মনিরপেক্ষতা তা তাদের কার্যক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে ক্রমাগতভাবে। কেবলমাত্র এদেশের ২ কোটির মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মোহাবিষ্ট করে রেখে তাদেরকে দলের ভোট ব্যাংকে পরিণত করার জন্যই দলীয় কর্মসূচিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আন্তরিক ও বিশ্বস্ত হতেন-তবে ৫শ' বছরের পুরাতন রমনা কালী বাড়ি পরিণত হতো না সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে শত্রু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্সটি লাভ করতো না সংসদীয় আইনের মর্যাদা, বন্ধ হয়ে যেতো না অনগ্রসর অনুন্নত পশ্চাদপদ হিন্দু তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত চাকরির কোটা ব্যবস্থা। এসব প্রশ্নের আলোকে আজ দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের সময় এসেছে আওয়ামী লীগ কতটুকু ধর্মনিরপেক্ষ তা ভেবে দেখার।

www.pathagar.com

হিন্দুদের বাঙালিত্বের বাঁধা কোথায়

ধর্মীয় বিশ্বাসের অভিপ্রায় আমি একজন হিন্দু। জন্ম ১৯৪০ সালে। তাই জন্ম থেকে ৭ বছর পর্যন্ত আমার জাতীয় পরিচয় ছিল ভারতীয়। ৭ বছর পর আমার পরিচয় পাল্টে গেল। ১৯৪৭ সালে আমি হয়ে গেলাম পাকিস্তানী। ৪৭ থেকে ৭১ এই দুই যুগ পরে আমার জাতীয়তায় আমি বাঙালি। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে এ অর্জন। ৩০ লাখ মানুষের আত্মত্যাগ, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর ১ কোটি মানুষের সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ত্যাগের মধ্য দিয়ে এ উত্তরণ। '৫২'র ভাষা আন্দোলনে যার উন্মেষ, '৭১'র শেষ প্রান্তে এসে তার উজ্জীবন, আমাকে আশ্বস্ত করলো-স্থিরতা দিল। এতোদিন আমার জাতীয় অস্তিত্ব তার বিকাশের জন্য অপরিহার্য ভূমি স্পর্শ করলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়-সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আমার জাতি পরিচয় আবার পরিবর্তিত হলো। এবার আমি হলাম বাংলাদেশী। গারো, হাজং, সাওতাল, চাকমা, মুরং, ত্রিপুরা, পাহাড়ী, সমতলবাসী সবাই স্ব স্ব নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেই এক জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পথ খুঁজে পেল। এক জাতি, এক দেশ, বাংলাদেশী, বাংলাদেশ। জাতীয় পরিচয়ের এই বিবর্তন, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ৩টি দশক। তারপর হঠাৎ করে সেদিন জানলাম আমি অর্থাৎ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এখনো নাকি পুরোপুরি বাঙালি হতে পারিনি-ওটা হতে আমাদের আরো চেষ্টা করতে হবে। এ আবিষ্কার স্বয়ং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। উপদেশও তারই। সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী শুধু আমার বাঙালিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেননি-সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আমার দেশপ্রেম নিয়েও। তিনি আবিষ্কার করেছেন আমাদের এক পা ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে। আমরা অর্ধ-বাঙালি, অর্ধ-ভারতীয়। স্বাধীনতার ৩ দশক পর বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই মূল্যায়ণ আমার মনে যে প্রশ্নগুলোর সৃষ্টি করেছে তাহলো-'৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সম্প্রদায়ের শত শত ছেলের আত্মত্যাগ তবে কি মিথ্যা? তবে কি ১ কোটি হিন্দুর সর্বস্ব হারিয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়ে ৯ মাসব্যাপী মানবেতর জীবন যাপন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কোন অঙ্গ নয়? স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তির পর ১ কোটি মানুষের শূন্য ভিটায় প্রত্যাবর্তন এবং নতুন করে বসবাস শুরু করা কি তার দেশপ্রেমের পরিচয় নয়? সবই কি মিথ্যা? তা না হলে স্বাধীনতার ৩০ বছর পরে কেন আজ প্রশ্ন উঠেছে আমার বাঙালিত্ব নিয়ে? কেন সন্দেহ করা হচ্ছে আমার দেশপ্রেম নিয়ে? আমার বাঙালি পরিচয়ের বাঁধা কি আমার ধর্মীয় বিশ্বাস। আমার দেশপ্রেমে সন্দেহ কি কেবল আমি একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান বলে?

সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাঙালি হবার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু জাতি বা জাতীয়তাবোধ কি কারো উপদেশ হুকুম বা নির্দেশে গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবোধ একটি চেতনা-একটি অনুভূতি, একটি বিশ্বাস, যা গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহ-অবস্থান,সহানুভূতির মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদের উপাদান

www.pathagar.com

শুধু সহ-ধর্মীতা নয়, সহমর্মিতাও। বিশিষ্ট সংবিধানবিদ ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি, আর অম্বেদকরের ভাষায়–Nationality is a social feeling. It is a Feeling of a corporate sentiment of which makes those who are charged with it feel that they are kith and kin.

জাতীয়তাবাদের এই বিকাশের জন্য ভাষার ঐক্যই কেবল মাত্র যথেষ্ট নয়। বহু পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রেনান জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন–Language invites re-union, it does not force it. The United States and England Spanish America and Spain speak the same language and do not form single nation. On the contrary Swizerland which owes her stability to the fact that she was founded by the assent of her several parts counts three or four language. There is something superior to language will. The will of Swizerland to be united inspite of vericty of her language.

সুতরাং জাতীয় ঐক্যবোধ বা ঐক্য চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষাই একমাত্র উপাদান নয়। সম্প্রতি এক নিবন্ধে বিশিষ্ট সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, "যাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলি অবশ্যই সেটা একটা অনুভূতির ব্যাপার–কিন্তু কোন অনুভূতিই আপনা আপনি গড়ে ওঠে না-পেছনে কারণ থাকে ভেতরে থাকে ঘটনার তৎপরতা। জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় স্বার্থ চেতনা থেকেই। এই চেতনাটি যেমন আত্মস্বার্থের, তেমনি আত্ম পরিচয়ের-এক সময় এই দু'য়ে একাকার হয়ে যায় একটি ধারা প্রবাহে।

এই সমস্বার্থে চেতনা অর্থাৎ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্খাই৭১-এ এদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান তথা সমগ্র জাতিকে এক ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। দীর্ঘ দুই যুগের পাকিস্তানী শাসনে আর্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত প্রায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সেদিন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যেই তাদের জীবনের সার্বিক সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ দেখেছিল। তারা স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে, শান্তিতে থাকবে; সুযোগ পাবে নিরাপদে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে আত্মবিকাশের ও আত্ম প্রতিষ্ঠার। ভেবেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারা আর বৈষম্যের শিকার হবে না-শিকার হবে না সামাজিক, প্রশাসনিক ও সরকারি বৈষম্যমূলক আচরণের। এই বিশ্বাসই সেদিন এদেশের ধর্ম সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তারা আশা করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তারা পাবে সম-নাগরিকত্বের অধিকার, পাবে জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, প্রতিরক্ষাসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সমান সুযোগ এবং যথাযথ প্রতিনিধিত্বের আইনগত নিশ্চয়তা। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পর আর যদি সে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির খতিয়ান মিলাতে গিয়ে প্রাপ্তির ঘরে কেবলই শূন্যই দেখে, যদি দেখে স্বাধীনতার ত্রিশ বছরে এদেশের অনেকের ভাগ্যের অনেক পরিবর্তন হলেও তার

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে-যদি দেখে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনামলে সে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আইন-কানুন আর আচরণের শিকার হয়েছে আজও তেমনি হচ্ছে। যদি দেখে ত্রিশ বছর আগে সে যেমন ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে বিযুক্ত আজও তাকে তেমনিভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে-যদি দেখে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির ঐক্যমত্যের সরকারেও তার সম্প্রদায়ের একজন মানুষও লাভ করতে পারলো না পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা। আর এর প্রতিক্রিয়ায় যদি তার মনে সৃষ্টি হয় ক্ষোভ, বেদনা আর হতাশা তবে সে দোষ কি কেবল তার একার?

এই বেদনার কথা জানাতে এবং সেই সাথে কতকগুলো দাবি-দাওয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশী ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা গিয়েছিলেন তাদের একান্ত আস্থাভাজন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। তারা ভেবেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ না করলেও তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। অন্তত ভবিষ্যতে পুরণের জন্য বিবেচনার আশ্বাসটুকু পেলেও তারা পাবেন। কিন্তু না প্রশানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিনিধিবৃন্দকে তার বক্তব্য বলে দিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সে বক্তব্যে যেমন হয়েছেন বিস্মিত, তেমনি হয়েছেন ক্ষুব্ধ। সে ক্ষোভ তারা প্রকাশ করেছেন পত্র-পত্রিকায় দেয়া বিবৃতির মাধ্যমে। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য শ্রী কাজল ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে যা বলেছেন তার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায়। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–

"Kajal Bhattackajee, a Hindu Priest, made a statement to the effect that the Hindu Community has vehemntly condemened the PM's comments and accusations. The communal attitude of the so-called secular leaders of the Awami-League has been exposed through Sheikh Hasina's statement. We don't have the language to condemn her statement, we are totally surprised and disappointed by her attitude. Are there any person in this worle who are as pifable as us who are treated as foreiners in their own home land?"

He also questioned the PM's veracity about being unable to repeal the vested property act. He maintainance that the Act was common low the annulment of which does not require two third Majority in the Sangsad. It may be reseinded by the votes of a single majority and the Awami-League can this alone if it she really wants it "The prime Minister is trying to shirk her responsibility in his statement." We resent her attitude. This law which was enacted in 1965. was put into effect by the Awami-League Government in 1972. And most of the so-called enemy property was greedily grabbed by Awami-League leaders. That is probably why the Government is unwilling to repeal such on unjust law."

He then said that Shaikh Hasina here made the Hindus uncertain not only of their future but of their lives.

www.pathagar.com

In addition to the statement continued all we want to say with reagard to the Prime Mininster's remarks about minority communities having their legs on two boats is that it is completely unjustified and uncalled for. The minority community is sa patriotic as any other community.

শ্রী কাজল ভট্টাচার্য তার বিবৃতির শেষে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন–Expecting more co-operation from her than any other leaders, the 11 minority organisation submitted the memorandum to her but what a response we got! Her remarks are tantamont to truncating our coustitutional fights.

প্রবাসী সংখ্যালঘু নেতা কাজলল ভট্টাচার্যসহ দেশী-বিদেশী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিস্মিত হয়েছেন, বেদনাবোধ করেছেন-অনেকের বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে আর সেই সাথে উচ্চারিত হয়েছে রামপ্রসাদের গানের সেই কলি-'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে অনেকে বিস্মিত হলেও আমি বিস্মিত হইনি। কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন পেতেই অভ্যস্ত। তার জন্মলগ্ন থেকে এটাই সে পেয়ে এসেছে। যখনই নির্বাচন এসেছে তখন এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী শত ভয়-ভীতি-প্রলোভন সবকিছুকে উপেক্ষা করে কোন রকম দাবি-দাওয়া উত্থাপনের মতো তারা দুঃসাহস দেখায় তবে তাকে তিনি ধৃষ্টতা মনে করে ক্ষুব্ধ হতেই পারেন।

পরিশেষে সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই আমার এ নিবন্ধ শেষ করবো। সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী আপনি ভেবে দেখেছেন কি, যাদেরকে আপনি বাঙালি হবার উপদেশ দিয়েছেন-যাদেরকে দু'নৌকায় পা রাখতে নিষেধ করছেন-সেই অর্ধ-বাঙালি অর্ধ ভারতীয় সেই এক পা ভারতে এক পা বাংলাদেশে রাখা লোকগুলোর ভোটেই কিন্তু আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ বাংলাদেশের অন্যত্র সংখ্যালঘু হলেও আপনি যে তিনটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেই কোটালীপাড়া, দাকোপবটিয়াঘাটা আর মোল্লারহাটে এখনও কিন্তু তারাই সংখ্যাগুরু।

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের টানাপোড়নে হিন্দু সম্প্রদায়

১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যেদিন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হলো সেদিন থেকেই এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় পরিণত হলো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে। আর সেদিন থেকেই তারা হারালো সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস এবং সম্ভবত ভালোবাসাও। তারপর থেকে সারা পাকিস্তান আমল জুড়েই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, কি সরকার, কি বিরোধী দল, কি প্রশাসন, কি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তথা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই বলা যায় প্রায় একতরফাভাবেই অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার শিকার হয়েছে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগুরু অংশ যে তফসিলী জনগোষ্ঠী কংগ্রেসী নেতৃত্বের সমস্ত লোভ-প্রলোভন ও হুমকি ধামকিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলো এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাকিস্তানের সমর্থনে ভোট দিয়ে তফসিলী প্রধান জেলাগুলোর পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্তির পথ সুগম করেছিল তারাও এ অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার বাইরে থাকতে পারেনি।

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক কায়দে আজম জিন্নাহর অন্যতম আস্থাভাজক সহযোগী, অন্তবর্তী কালীন সরকারের মুসলিম লীগ মনোনীত আইনমন্ত্রী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলও এই অবিশ্বাসের হাত থেকে রেহাই পাননি। অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার শিকার হয়েই তাকে পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র তিন বছরের মধ্যেই দেশত্যাগ করতে হয়েছে। দেশ ত্যাগের মুহূর্তে তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে লেখা পদত্যাগ পত্রে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এই আস্থাহীনতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"It may also be mentioned in this connection that I was opposed to the parton of Bengal in Launching a campaigns in this regard I had to face not only tremeudous resistance from all quarters but also unspeakable abuse, insult and dishonour with great regret I recollect those days when 32 crore of Hindus of the Indo-Pakistan sub-continent turned their back against me and dubbed me as the enemy of Hindus and Hindustan but I remained undaunted and unswered in my loyalty to Pakistan. It is a matter of gratitude that my apeal to 7 million schedulede castes people of Pakistan evoked a ready and enthusiastic respouse from them. They lent me their unstinted support sympathy and encouragement.

৩২ কোটি বর্ণ হিন্দুর নিন্দা, গ্লানি, অপমান, ভৎসনাকে উপেক্ষা করে যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন তার প্রতি পাকিস্তানী

www.pathagar.com

শাসকগোষ্ঠী তিন বছরের বেশি আস্থা রাখতে পারেনি এবং যে তফসিলী সম্প্রদায়ের শত লোভ প্রলোভন ও প্ররোচনা সত্ত্বেও দেশত্যাগ না করে নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের আইন-শৃংখলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তারাও সরকার ও প্রশাসনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছরের মধ্যে দেশত্যাগে বাধ্য হলো। তাদের এই দেশ ত্যাগ সম্পর্কে বলতে যেয়ে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল লিয়াকত আলী খানকে লিখলেন ঃ

"I would like to reitere in this connection my firm conviction that the East Bengal Government is still follwing the well planed policy of squezing Hindus out of the province.

In my discussion with you on more than one occasion (gave expression to this view of mine. I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeed completly in West Pakistan and is nearing completion in East pakistan too. Pakistan has not given the Muslim League entre satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu inteligenta so that the political, economic and social life of Pakistan may not in way be influenced by them."

পাকিস্তান সরকারের এই বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক আচরণ অব্যাহত থেকেছে সারা পাকিস্তান আমল জুড়েই। মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর ফলে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের প্রবাহ শুরু হয়েছে পাকিস্তানের উষালগ্ন থেকেই। দেশত্যাগের এই প্রবাহে কখনো এসেছে ভরা জোয়ার বান, কখনোবা সে স্রোতে অনুভূত হয়েছে সামরিক স্তিমিতির লক্ষণ, কিন্তু স্রোত কখনোই রুদ্ধ হয়নি। দেশত্যাগের নিত্য চলমান প্রবাহের কারণেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পরিণত হয়েছে একটি ক্রমহ্রাসমান জনগোষ্ঠীতে। তাই দেখা যায় দেশভাগের প্রাক্কালে যেখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ছিল ২৮ জন, ১৯৫১-তে সে হার নেমে দাঁড়ায় শতকরা ২২.৫ এবং ১৯৬৪-তে তা নেমে এসে দাঁড়ায় শতকরা ১৮.৫। আদমশুমারীর এই পরিসংখ্যানে দেখা যায় মাত্র দেড় দশকেরও কম সময়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমেছে শতকরা দশ শতাংশের বেশি। বিস্ময়ের বিষয় হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পরও সংখ্যালঘুদের সংখ্যা হ্রাসের এই ধারার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আদমশুমারীর রিপোর্টগুলোতেও তাই দেখা যায়, ১৯৬১ সালের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ১৮.৫ থাকলেও ১৯৭৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৩ শতাংশে এবং ১৯৮১ ও ১৯৯১-তে তা যথাক্রমে নেমে এসেছে শতকরা ১৩.৫ এবং শতকরা ১২.৫-এ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা হ্রাসের এই ঘটনাকে আমি বিস্ময়কর বলছি এ জন্য যে, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তি যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল এমন একটি দেশ গড়ে তোলা, যেখানে শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না, নির্যাতন নিপীড়ণ থাকবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ সমান বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

এই বিশ্বাস, আশা আর স্বপ্নকে বুকে নিয়েই ১৯৭১-এ ১৬ ডিসেম্বরের পর এক কোটি হিন্দু শরণার্থী, ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহ থেকে তাদের লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত শূন্য ভিটায় ফিরে এসেছিল। শ্মশানতুল্য শূন্য ভিটায় নতুন করে ঘর বেঁধেছিল এই আশা নিয়ে যে, অতঃপর আর কেবলমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের কারণে তাদের নিপীড়ন নির্যাতন আর বৈষম্যের শিকার হতে হবে না-শিকার হতে হবে না বঞ্চনা আর অবিশ্বাসের। নয় মাসব্যাপী ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ আর মানবেতর জীবন যাপনের পর যে বাংলাদেশে তারা ফিরে এলো, সেখানে আর কেউ তাদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করবে না-প্রশ্ন তুলবে না তাদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব নিয়ে। কিন্তু অচিরেই তাদের সে বিশ্বাসে চিড় ধরলো। বুকভরা আশা পরিণত হলো বুক ভাঙ্গা হতাশায়। রাজাকার আলবদর-আল শামস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের দ্বারা লুণ্ঠিত মালামাল, অধিকৃত জমি জমা ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও সরকারি দল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা একান্তভাবেই নিরাশ হলো। প্রত্যাগত শরণার্থীদের অনুকূলে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত হলো না কোনো আইন। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার মাত্র দেড় মাসের মাথায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যবন্ধু আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা মোল্লা জালাল স্বাধীনতাকে পক্ক বিফল আর সংখ্যালঘুদেরকে সে ফল ভোগেচ্ছু লোভী বায়সের সাথে তুলনা করে করলেন এক নিষ্করুণ পরিহাস।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মুলনীতি হিসেবে গৃহিত হলেও শেখ মুজিবের শাসনামলেই তা পরিণত হলো নিছক অলংকরণে-তার নেতৃত্বেই ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ সদস্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র সংঘের। গঠিত হলো ইসলামী ফাউণ্ডেশন (যদিও হিন্দু ফাউণ্ডেশনের দাবী আজও উপেক্ষিত)। বর্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পাঁচশত বছরের পুরাতন রমনা বালী বাড়িকে তার নির্দেশেই বুলডজার দিয়ে গুড়িয়ে তার রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীর নামে সে স্থানে তৈরি করা হলো সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান।

হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ আর আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি নামক অধ্যাদেশটি তার নির্দেশেই অর্পিত সম্পত্তি নামে রূপান্তরিত বা নবায়িত হয়ে তার ভিত্তিমূলকে পাকাপোক্ত ও দৃঢ় করে লাভ করলো সংসদীয় আইনের মর্যাদা।

শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের এইসব কার্যক্রম দেখে, "সংখ্যালঘু সংকট গ্রন্থের" লেখক কংকর সিংহ যখন মন্তব্য করেন "সংখ্যালঘুদের প্রতি মমত্ববোধ ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের যাত্রারম্ভেই নিরপেক্ষ থাকেনি। শেখ মুজিব, তার আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসাবে গ্রহণ করলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি উদার হতে পারেননি।

১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলো। এরপর '৭৫ থেকে '৯৬ এই দুই দশকে কখনো ক্যু, কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, স্বৈরাচারী এক নায়ক এরশাদ, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। দুই যুগব্যাপী কালপর্বে দেশের রাজনীতি সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে বারবার কিন্তু

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে বললে ভুল হবে বরং বলা যায়, তাদের ভাগ্যাকাশ এই সময়কালে অন্ধকার থেকে রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশালী পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সুগম করেছেন সেই সাথে সংবিধান থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা। এর ফলে অন্তত কাগজে কলমে হলেও সংখ্যালঘুদের সমনাগরিকত্বের যে সাংবিধানিক ভিত্তি ভূমিটুকু ছিল তাও ধসে গেল-শুরু হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সাংবিধানিকভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার পরিণতিতেই সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে এরশাদ এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পুরোপুরিভাবে পরিণত করলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ এই সিকি শতাব্দী কাল ধরে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে জিম্মি বা আমানত হিসেবে বাস করার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনোজগতে যে হীনম্মন্যতা ও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সাথে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল; ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় তা থেকে মুক্তির যে সাময়িক বার্তাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল-৮ম সংশোধনীর ফলে তা একেবারেই নস্যাৎ হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে স্বাধীনতার পর এদেশে ঘুরে ফিরে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, আর জাতীয় পার্টির মধ্যেই ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। এই তিনটি দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ তার সৃষ্টি লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বলা যায় প্রায় একতরফাভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে এসেছে। তাই দেখা যায়, নির্বাচনের মাধ্যমে যখনই মতামত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে তখনই হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগের অনুকূলেই তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোভ, প্রলোভন, হুমকি-ধামকি কোনকিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

এমনকি তার শাসনামলের সাড়ে তিন বছরে শেখ মুজিব যখন শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করে তাকে অর্পিত সম্পত্তি নামে নবায়ন করে আরো পাকাপোক্ত করলেন, রমনা কালী বাড়িকে করলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত চাকরির কোটাকেও ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে বাতিল করে দিলেন-তখনও তারা শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাসহারা হননি। তারা মনে করেছে শেখ মুজিবের এসব কার্যক্রম একান্তই সাময়িক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিপর্যয় কেটে গেলে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হলে শেখ মুজিব তাদের সমস্যার দিকে নজর দেবেন-অবসান ঘটাবেন তাদের সকল দুর্দশার, সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান হবে তাদের সকল সমস্যার। শেখ মুজিবের প্রতি তাদের আস্থা-বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল এতটাই দৃঢ় ও গভীর। শেখ মুজিব আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ায় তাদের বিশ্বাসের ও ভিত্তিমূলক শিথিল না হয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে। তারা মনে করেছে শেখ মুজিবের হত্যাই তাদের দুঃখ-দুর্দশা প্রলম্বিত হওয়ার কারণ। তাই দীর্ঘ একুশ বছর ধরে তারা লালন করেছে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করার স্বপ্নকে।

এ কারণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এলো তখন এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী ভালোবাসায়, আশায় প্রত্যাশায় আনন্দে

www.pathagar.com

আবেগে আবার উদ্বেল হয়ে উঠলো। এবার আর আশা নয়-বিশ্বাসও করলো তাদের সকল দুঃখ দুর্দশার এবার অবসান হবে।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ তার শাসনকালের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিককাল অতিক্রম করেছে। আওয়ামী লীগের এই সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তার সফলতা বা বিফলতার পাল্লা দু'টির কোনটি কতটা ভারী হয়েছে তা দেখানো এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু এটুকু দেখানো যে অনেক আশা-প্রত্যাশা সত্ত্বেও এই সাড়ে তিন বছরের হিন্দুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিকতর হতাশা ও আস্থাহীনতায় আচ্ছন্ন। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই নিরাশাগ্রস্ত জীবনের কথা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিমচন্দ্র ভৌমিক। তার ভাষায়, "অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম, দু'দু'টো গণঅভ্যুত্থান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সর্বশেষে ১৯৯৬ সালের সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে আশা জাগে নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ হবে ও ক্ষোভ-হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার অবসান ঘটবে, কিন্তু নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গৃহিত হলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী অবস্থার সার্বিক কোনো উন্নতি হয়নি।

বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বুলেটিন থেকে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২২৩টির মতো সাম্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ১০টি। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে জায়গা জমি জবরদখল, বাড়িঘরে হামলা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, বিগ্রহ ভাঙচুর এবং চুরি, নারী অপহরণ, লুটপাট ও হত্যা, দেশত্যাগের জন্য হুমকি ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে, প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার সব ঘটনার বিবরণই ঐক্য পরিষদের কাছে আসে তা নয়। মূলত ঐক্য পরিষদের শাখাসমূহের পাঠানো প্রতিবেদন থেকেই নির্যাতন নিপীড়নের ওপর বুলেটিন তৈরি হয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গত কয়েক বছর ধরে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়নের হার প্রতিমাসে গড়ে ১০ থেকে ১৫। গত এক দশকে এই হারের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আমি ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি আওয়ামী লীগের ওপর হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, অনুরক্তি ও ভালোবাসা যেমন অগাধ তেমনি তার কাছে তাদের প্রত্যাশাও অনেক। এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যখন অযৌক্তিক ফারাক দেখা দিয়েছে অর্থাৎ প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি যখন হচ্ছে না তখনই হিন্দুদের বিশ্বাসে ধরেছে চিড়-মনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা ও তজ্জনিত ক্ষোভ। হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর এই হতাশা–ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটে চলেছে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি ও আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের একান্ত অনুরাগী ও অনুগত হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ক্ষোভের প্রকাশকে দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা বলেই মনে করেছে। তাই সংখ্যালঘুদের দাবি-দাওয়া পুরণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে তারা হয়েছেন রুষ্ট ও বিরক্ত।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের এই বিরক্তি ও উষ্মার চরম প্রকাশ ঘটেছে বিগম সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধামনমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আমেরিকা সফরের সময়। তিনি যখন নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন সে সময় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কয়েকজন নেতা কর্মী বিভিন্ন দাবি-দাওয়া-যেমন শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল, রমনা কালী বাড়ির জায়গা প্রত্যার্পণ, হিন্দু ফাউণ্ডেশন গঠন ইত্যাদি নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দেন তার মধ্য দিয়ে।

দৈনিক জনতা, দৈনিক দিনকালসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের খবরে প্রকাশ এই সাক্ষাতকালে শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু নেতাদের বলেন, "আপনাদের এক পা ভারতে আরেক পা বাংলাদেশে। দুই নৌকায় পা রাখবেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হতে চেষ্টা করুন। শত্রু সম্পত্তি বাতিলের প্রশ্নেও তিনি নেতিবাচক মন্তব্য করেন বলে পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। রমনা কালী বাড়ির জায়গা প্রত্যার্পণ ও সেখানে মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে রমনায় স্বাধীনতার স্মারক স্তম্ভ স্থাপনের কথা বললেও মন্দির নির্মাণের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান।

শেখ হাসিনার এই বক্তব্যে হিন্দু সম্প্রদায় বিস্মিত বিমূঢ় ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সে ক্ষোভ তারা প্রকাশও করেছেন বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে। বস্তুত শেখ হাসিনার এই বক্তব্যে এ দেশের হিন্দুদের প্রতি তার চিন্তা-চেতনা ও মনোভারের যে উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে তাতে এ দেশের হিন্দুদের পায়ের তলে বিশ্বাসের যে শেষ ভূমিটুকু ছিল তাতেও ধস নেমেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দেশপ্রেমের প্রতিই কেবল কটাক্ষ করেননি-তিনি হিন্দুদের নাগরিকত্ব, জাতীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি পুরো হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমানিত করেছেন। গোটা হিন্দু সম্প্রদায় তার এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে, দাবি জানিয়েছে তার এ বক্তব্য প্রত্যাহারের; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ওসব প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার বক্তব্যে অবিচল থেকে প্রমাণ করেছেন তিনি যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই-আজ আপনি যাদের দেশপ্রেম, জাতীয়তা এবং নাগিরকতা নিয়ে কটাক্ষ করছেন খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান কতখানি? আপনি জানেন কি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের অত্যাচারে চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায়, আসন্ন প্রসবা যুবতী স্ত্রী, দুগ্ধপোষ্য শিশু, সদ্যজাত সন্তান আর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সঙ্গে নিয়ে দু'শ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে যারা ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহে আশ্রয় নিয়েছিল তারা কারা? একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, সেদিন যে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই ছিল হিন্দু। সেদিন সেই এক কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ এবং মানবেতর জীবন যাপনের দৃশ্যই বিশ্ব জনমতকে বাংলার স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। সেই এক কোটি মানুষের সীমাহীন ত্যাগ-আত্মপীড়ন ও আত্মনিগ্রহের মহাবেদনার মহাসমুদ্র মন্থনের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

www.pathagar.com

সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন আজ যাদের বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন সেই হিন্দুরা কতখানি বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর ভারতের মাটি থেকে তাদের শ্মশানতুল্য শূন্য ভিটায় ফিরে এসেছিল? তাদের দেশপ্রেমে যদি এতটুকুনও ঘাটতি থাকতো তাহলে সেই এক কোটি মানুষ দেশে ফিরে আসতো না-ভারতের মাটিতেই থেকে যেত। সেদিন অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সে আগমন অভিনন্দিত হয়নি-যদিও সেদিন ক্ষমতায় ছিল আপনারই দল-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। সবচেয়ে বড় কথা সেদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এদেশের হিন্দুদের কাছে দেব সমতূল্য প্রিয় তাদের প্রাণপুরুষ আপনার মরহুম পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। তবুও সেদিন সেই ফিরে আসা শরণার্থীদের বহু প্রতিকুলতা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে-ছেড়ে যাওয়া ঘড়-বাড়ি-ভিটে-মাটির দখল পেতে। লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত পায়নি বলতে গেলে কেউই। যদিও সেসব ছিল তাদের আশপাশের প্রতিবেশীদের কাছেই। আওয়ামী লীগ সরকার সেসব ফেরত পাওয়ার জন্য কোনো আইন করেননি। শেখ মুজিব সে সব ফেরত দেয়ার জন্য জারি করেননি কোন নির্দেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে- কিন্তু রাজাকারদের লুটের মাল ফেরত দেয়ার কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবু তারা নিরাশ হয়নি। শত নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যেও তারা এই আশা পোষণ করেছে যে, এ দেশে একদিন গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতায় আসবে-আর সেদিন অবশ্যই তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে।

আজ সাড়ে তিন বছর আপনি ক্ষমতায় এসেছেন। এই সাড়ে তিন বছরে ফারাক্কা চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রভৃতির মতো অনেক কঠিন, বলা যায় প্রায় অসাধ্য কাজ সম্পাদন করেছেন; কিন্তু হিন্দুদের জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ শত্রু সম্পত্তি আইন কেন বাতিল হলো না? কেন এবারও রমনা কালী বাড়িতে অনুষ্ঠিত করা গেল না কালী পূজা? রমনায় স্বাধীনতার স্মৃতি স্বম্ভ নির্মিত হবে বলে আপনি বলেছেন, ওর পাশাপাশি কি নির্মাণ করা যেত না ২/৪ শতাংশ জমির উপর ছোট্ট একটি কালী মন্দির? কোথায় আপত্তি?

কেন ইসলামী ফাউণ্ডেশনের ন্যায়, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টকে রূপান্তরিত করা গেল না হিন্দু ফাউণ্ডেশন-কেন গত তিন বছরে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের বিএনপি সরকারের দেয়া সাত কোটি টাকাকে আর বাড়ানো গেল না? কেন দরিদ্র অনগ্রসর তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য বেগম জিয়া কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২০ লাখ টাকা এক পয়সাও বৃদ্ধি পেল না,-গত তিন তিনটা বাজেটে? কেন আপনার মন্ত্রী পরিষদে একজন হিন্দুও অন্তর্ভূক্ত হতে পারলো না ক্যাবিনেট বা পূর্ণ মন্ত্রী পদমর্যাদায়?

আপনি হিন্দুদের দুই নৌকায় পা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু খোঁজ করে দেখেছেন কি কেন তারা দু'নৌকায় পা রাখে? সম্মানীয়া প্রধানমন্ত্রী, তারা কি সাধ করে দুই নৌকায় পা রাখে? নাচতে নাচতে আরেক নৌকায় চলে যায়? গিয়ে খুব আয়েশের জীবন যাপন করে? তাদের তাড়ানো হয়। তাড়ায় আপনার বাংলাদেশের আইন, বাংলাদেশের সমাজ। কত মানুষই যে সাতচল্লিশকে অগ্রাহ্য করে এদেশকে নিজ দেশ জ্ঞান করে এখানে থেকে গেল, পঞ্চাশের দাঙ্গায়ও গেল না, চৌষট্টিকেও করলো হজম,

www.pathagar.com

এরশাদী হামলাকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে এখনও বাংলাদেশের জনসংখ্যার দশ শতাংশের কাছাকাছি যে মানুষগুলো মাটি কামড়ে পড়ে থাকলো, যদি ছাপা খবর সত্য হয়, আপনি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। অন্য সকলের কথা বাদ দিন, গত তিন বছরের অধিককালে আপনি এমন কিছু করতে পারেননি যাতে করে হিন্দুরা এদেশকে নিজেদের দেশ মনে করতে পারে। পাকিস্তানে তারা ছিল জিম্মি, স্বাধীন বাংলার সংবিধানটা পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। জারের রাশিয়ায়, হিটলারের জার্মানিতে ইহুদীরা ছিলেন যেমন বাংলাদেশে হিন্দুরা তারচেয়ে বড় একটা ভালো নেই।

আজ এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশপ্রেম এবং জাতীয়তা নিয়ে যিনি বা যারা প্রশ্ন তুলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কোন দেশে কেবল জন্মগ্রহণ করলেই দেশটা স্বদেশ হয় না, যদি না সে দেশের সকল ক্রিয়াকাজের সাথে তার যুক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকে যদি না থাকে মালিকানা, অংশিদারিত্ব বা শরিকানার অধিকার।

পরিশেষে প্রায়ত সাংবাদিক সন্তোস কুমার ঘোষের একটি মন্তব্য উল্লেখ করেই আমার নিবন্ধের শেষ করবো। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকার ও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর দায়িত্বের কথা বলতে যেতে তিনি বলেছিলেন, "ভাষা জাতি গড়ার একটা মসল্লা হতে পারে কিন্তু একমাত্র মসল্লা কখনই নয়। এ আমার নিশ্চিত প্রত্যয়। সমাজের স্তরে স্তরে সুযোগ সুবিধা আর স্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্যের মধ্যেই বিচ্ছেদের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, ক্রমে ক্রমে তা ফুটেও ওঠে। দেশের এক বিপুলসংখ্যক সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে কোন রাষ্ট্রই তাদের আনুগত্য পেতে পারে না, আর আনুগত্যহীন নাগরিক যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সমস্যার কারণ। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতি কাম্য হলে নাগরিকদের মধ্যে ভেদ ভাব বজায় রাখার প্রশ্ন ওঠে না। গণতন্ত্রের অর্থ তো কেবল সংখ্যাগরিষ্টের শাসন নয়-গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত-নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অবস্থিতি। বাংলাদেশে সেটা কতটুকু আছে?

www.pathagar.com

আইয়ুব খান নয়, শেখ মুজিবই শত্রু সম্পত্তি আইনের স্রষ্টা

বিগত মাসাধিককাল ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনটি নিয়ে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন বক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে এ আইন বাতিলের দাবি জানাচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এ দাবিতে সভা, সমাবেশ, মিছিল এমনকি অনশন পর্যন্ত করেছে। সম্প্রতি একসভায় ঐক্য পরিষদ এ আইন বাতিলের দাবিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান আসন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যানার টাঙ্গানোর মত কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিলের এসমস্ত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় আইনটি সম্পর্কে বিভিন্ন খবর প্রতিবেদন এবং নিবন্ধ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমার এ লেখার অবতারণা।

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনটি অবশ্যই একটি নিপীড়ন, নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক কালো আইন। পাকভারত যুদ্ধের অজুহাতে সৈরাচারি এক নায়ক আইয়ুব খান কর্তৃক ১৯৬৫ সালেল ৬ ডিসেম্বরে জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি হারিয়ে পরিণত হয়েছে একটি নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা জনগোষ্ঠীতে।

তিন দশকেরও অধিককাল ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর জগদদল পাথরের মত চেপে বসা, তাদের জীবনে এক মূর্তিমান অভিশাপ এই আইনটির জন্য এদেশে হিন্দু সম্প্রদায় পাকপ্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকেই দায়ী করে থাকে। কিন্তু তাদের এই ধারণাটি পুরো সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র। ১৯৬৫ সালেল ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারতে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন জারি করেন তারই ১৬৯ নং বিধিমতে জারি করা হয় শত্রু সম্পতি অর্ডিন্যান্স। পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে এই অর্ডিন্যান্সটির বিলোপ্তি ঘটার কথা। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তা হয়নি-পক্ষান্তরে সারা পাকিস্তানী আমল জুড়েই আইনটি বহাল থেকেছে। ১৯৭১ সালে অবসান ঘটে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের কালো অধ্যায়ের।

২৬শে মার্চ অভ্যুদয় হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। স্বাধীনতার সেই উষালগ্নে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার দাবি করেন proclamation of Independ ence and laws contian uances order 1971. নামক এক দীপ্ত ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী কোন আইন বাংলাদেশে বহাল কিংবা কার্যকর থাকবে না বলে সুদৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আশা করেছিল পাকিস্তানের অবসানের সাথে সাথে অবসান ঘটবে পাক-আমলের সমস্ত নির্যাতন, অর্পিত (শত্রু) কালো আইন

www.pathagar.com

সমূহের এবং অবশ্যই অর্পিত শত্রু সম্পত্তি আইনের আজ সেটা ছিল ন্যায় ও আইনগত এবং যুক্তিযুক্ত আর কার্যত ঘটেছিল তাই। ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহে কোটি মানুষের কল্পনাতিত কষ্টভোগ, ৩০ লাখ মানুষের আত্মত্যাগ ২ লাখ মা বোনদের সম্মানহানীর মধ্যে দিয়ে হিন্দু মুসলমানদের মিলিত রক্ত ধারায় স্নাত হয়ে উত্থিত হলো যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নকারী এই আইন আর পূর্ণজীবিত হবে না এটা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের ধীর বিশ্বাস ও নিশ্চিত প্রত্যয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের বিশ্বাস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ৩০ লাখ শহীদের রক্ত সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পাকিস্তানের সেই বৈষম্যমূলক আইনটি আবার পুনর্জীবিত হয়েছে এবং তা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের একান্ত আস্থাভাজন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারাই, তারই নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ শাসনামলেই। নিদারুণ হলেও এটাই বাস্তবতা এটাই ইতিহাস।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দেশের আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক স্থিরতা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আইনগত শূন্যতা পুরণের জন্য একের পর এক অধ্যাদেশ জারি শুরু হয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার ২৬/৩/৭২ ইং তারিখে বাংলাদেশের সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ন্যস্তকরণ আদেশ (Bangladesh vesting of property and assets order 1972 জারি করে। উক্ত আদেশে বলা হয়, "all properties which during the Government fo Pakistan vested in that Government have from 26.3.72 vested in the Government of Bangladesh). "উপরোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির সঙ্গে পাকিস্তান আমলে ঘোষিত শত্রু সম্পত্তিসমূহও বাংলাদেশ সরকারের ওপর অর্পিত হয়। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ১ নং আদেশটিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যথারীতি বলবৎ হয়ে যায়। তাই বলা যায় পাকিস্তানে শত্রু সম্পত্তি আইনের প্রবর্তক স্বৈরাচারী একনায়ক আয়ুব খান হলেও বাংলাদেশে এ আইনের জন্মদাতা শেখ মুজিবুর রহমানই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তির কারণে ভারতীয় নাগরিকদের সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে আখ্যায়িত অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিককে শত্রু হিসেবে পরিগণিত করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ এক অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাপ ও অনিবাসী সম্পত্তি (পরিচালনা) আইন (The vested and Bon-Resident Property Administration Act) নামে এবং অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের বুনিয়াদে সমস্ত শত্রু সম্পত্তি সরকারের ওপর ন্যস্ত হয় এবং এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে পরিচিত না হয়ে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এই অধ্যাদেশটিকে অতঃপর ২৩/৪/৭৪ তারিখে অতীত কার্যক্ষমতাসহ (Retrospective Effect) পার্লঅমেন্টে পাস করিয়ে সংসদীয় আইনের মর্যাদা দান করে তার ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করে।

এত কিছুর পরেও আওয়ামী লীগ রাজনীতির মোহে মোহাচ্ছন্ন হিন্দু সম্প্রদায় আশা করছিল মাত্র একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে আওয়ামী লীগ তাদের প্রবর্তিত এই

www.pathagar.com

আইনটি অবশ্যই বাতিল করবে-এ আশ্বাসও তারা দিয়েছিল। আর এই বিশ্বাস ও আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই হিন্দু সম্প্রদায় বিগত ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে প্রায় একতরফাভাবেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় এই একচেটিয়া ভোটের বদৌলতে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে তার শাসনকালের চার বছর অতিক্রম করে পাঁচ বছরেরও এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করতে চলেছে, কিন্তু শত্রু সম্পত্তি যে অবস্থায় ছিল-সেই অবস্থায়ই পড়ে আছে। আওয়ামী লীগের ফিক্সড ডিপোজিড বলে কথিত হিন্দু সম্প্রদায় হাজারো আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতি-মিনতি করেও এক্ষেত্রে কেবলমাত্র কমিশন, কমিটি, সাব-কমিটি, বিশেষ কমিটি গঠনের মত সময় ক্ষেপণমূলক কিছু কার্যক্রম গ্রহণ ভিন্ন কার্যত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের নামে আওয়ামী লীগের এই কালক্ষেপণকারী দীর্ঘসূত্রি পদক্ষেপ হিন্দু জনমনে যে হতাশা অবিশ্বাস ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বিগত মাস খানেকের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মিটিং-মিছিল-সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

ইতোমধ্যে বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ নেতা কালিদাস বড়াল নিহত হওয়ায় এবং তার হত্যাকাণ্ডের সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের জড়িত থাকার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবির আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ইতোপূর্বে সংসদীয় কমিটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তির বিলের খসড়াটিকে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করে বিষয়টি সরকারি প্রচার মাধ্যমসহ পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এসব প্রচার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে নতুন করে আবার আশা জাগে চলতি অধিবেশনেই বিলটি পার্লামেন্টে পেশ করা হবে এবং পাস হয়ে যাবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সংসদীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া বিলটি আবার মন্ত্রী পরিষদের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটিতে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পেরণ করে সেই কালক্ষেপণের পথকেই সুগম করা হয়। সরকারের এ পদক্ষেপে হিন্দু জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এ পদক্ষেপকে কালক্ষেপণের প্রক্রিয়া হিসাবে মনে করছেন, তেমনি অতিউৎসাহী কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এ পদক্ষেপকে আইনটি বাতিলের শুভ পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে আগাম ধন্যবাদও জানিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু প্রস্তাবিত বিলের খসড়ায় যেখানে আইনটি সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে-মন্ত্রীপরিষদ যদি হুবহু সেভাবেই বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করে এবং আইনটি যদি সেভাবেই পাসও হয় তবে তাতে কি এ আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনো উপকার হবে?

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই ভয় পায়। হিন্দু সম্প্রদায় দেখেছে অতীতে আইনটি যতবার সংশোধিত হয়েছে ততবারই তা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে তাদের দুর্ভোগের মাত্রাকে বর্ধিতই করেছে। এবার তাদের আশা ছিল আইনটি আর সংশোধিত না হয়ে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাবে। বস্তুত এরকম আশ্বাসই তারা পেয়েছিল শাসক দলের কাছ থেকে। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এই আশাই

www.pathagar.com

তারা পোষণ করেছে। এই স্বপ্ন আশা আর বিশ্বাস নিয়েই ৯৬'র ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রায় একতরফাভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সংসদীয় কমিটির প্রস্তাব বা সুপারিশে তাদের সে আশা ও বিশ্বাসের আদৌ কোনো প্রতিফলন ঘটে নাই।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে "শত্রু সম্পত্তি আইনের অধীনে যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারীর পূর্বে তালিকাভুক্ত করা হয়নি বা উক্ত সময়ে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে যেসব সম্পত্তি সরকারের দখলে নেই কিংবা উক্ত তারিখের পরবর্তী সময়ে যেসব সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকার তার দখল নিয়েছে ওই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না। এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত সম্পত্তিকে মূল মালিকের স্বত্ত্ব স্বার্থ ও দখল ওই আইনের বিধানমত পুনর্বহাল হবে। তবে অর্পিত সম্পত্তির মূল মালিক কেউ বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলে তার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না, বিদেশী নাগরিক তার পূর্ব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। এ সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট ন্যস্ত হবে।

উদ্ধৃত প্রস্তাবে দেখা যায় ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালেল ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তালিকাভুক্ত এবং সরকারের দখল নেয়া সম্পত্তি কোনো অবস্থাতেই মূল মালিকের কাছে প্রত্যার্পিত হবে না। অর্থাৎ এগুলো সরকারের হাতেই থেকে যাবে। কিন্তু কেন? ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানের জরুরি অবস্থা থাকাই কি এর একমাত্র কারণ? তাহলে কি ওই ১৯৬৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আইনটি বৈধ ছিল? একই আইনের দ্বারা তালিকাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই সময়গত বিভাজনের কারণ কি?

এর পরের প্রশ্নটি সম্পত্তির মালিকের নাগরিকত্ব নিয়ে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। উক্ত আইনে শত্রুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল–

"Any individual who posses the nationality of a State at war with or engaged in military operation against Pakistan or having possed such nationality at any time has lost in without acquiring another nationality or (b) anybody or persons constituted or in-corporated in or under the law of such Stat" সুতরাং ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের পর যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাবদ্ধ হয়েছে সেগুলোর মালিক যে বিদেশী তথা ভারতীয় নাগরিক হবে এটাই ছিল স্বতঃসিদ্ধ এবং আইনসঙ্গত। কিন্তু শত্রু সম্পত্তি হিসাবে ভারতীয় নাগরিকদের সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের অসাবধানতা ভুল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও দুর্নীতিপরায়ণতার কাজে এমন অনেক সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তির তালিকাভূক্ত হয়েছে এবং ওই তালিকা মোতাবেক সরকার ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯-এর ১৬ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ওই সম্পত্তির দখলও নিয়েছে যেসব সম্পত্তির মালিক ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেন এবং এখনও আছেন। এক্ষেত্রে ওই মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা এ সম্পত্তি ফেরত পাবেন কিনা? এ প্রশ্নটা উঠেছে এ কারণে যে প্রস্তাবিত অর্পিত সম্পত্তি দখল ও পুনর্বহাল আইনের

www.pathagar.com

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫'র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯'র ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ তালিকাভুক্ত এবং সরকারের দখলকৃত সম্পত্তি সরকারের দখলেই থেকে যাবে।

প্রস্তাবিত আইনের বিলটির চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে ১৯৬৯'র ১৬ ফেব্রুয়ারীর পর যেসব সম্পত্তি শত্রু অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে সেসব সম্পত্তি সরকার কর্তৃক দখলীকৃত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সেসব সম্পত্তি তার মূল মালিকের অধিকারে প্রত্যর্পিত হবে। তবে এক্ষেত্রে মূল মালিককে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে ১৯৬৯ম্বর পর যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের সম্পত্তিও থাকতে পারে বা আছে। এ ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিক যদি বাংলাদেশী হন বা বর্তমানেও বাংলাদেশে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্যরকম হয় যে কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ১৯৬৯'র পর অর্থাৎ ১৯৭০, ৭১, ৭২ বা ৭৩-এর পর কোনো এক সময় শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং হয়তো বা এ কারণেই '৭৪ এর বা তৎপরবর্তীকালে কোনো এক সময় তিনি দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন বা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বর্তমান আইনে উক্ত মালিকের সম্পত্তি কি প্রত্যর্পিত হবে এবং হলে কার কাছে হবে?

দ্বিতীয়ত যদি এমন হয় যে, কোনো মালিকের সম্পত্তি তিনি দেশে থাকা অবস্থায় ১৯৭৩, '৭৪ বা '৭৫ সালে শত্রু সম্পত্তি নিরূপণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ভুলে বা অসদুদ্দেশ্যক্রমে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ব্যাপারটা হয়েছে মালিকের অজান্তে এবং তিনি সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসে সে সম্পত্তি বিক্রি করে বিদেশে চলে গেছেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত ক্রেতা ক্রয়সুত্রে উক্ত সম্পত্তি ফেরত পাবে কি না?

প্রস্তাবিত বিলে দেখা যায়, শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের নামে কেবলমাত্র আইনটি সংশোধিত হচ্ছে এবং তা হচ্ছে যেসব সম্পত্তি ভুলক্রমে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে সেসব সম্পত্তি তার বাংলাদেশী নাগরিকদের ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। গত ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে "অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০০ নামের আইনটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে এখন বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসব নাগরিক তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়ায় বিব্রতকর অবস্থায় আছে তাদের সমস্যার সমাধান করা। এই আইন কোনোমতেই দীর্ঘদিন আগে দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশের নাগরিক হয়েছেন বা বসবাস করছেন তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে না...প্রস্তাবিত আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে-এদেশের সংখ্যালঘু যেসব নাগরিক তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাদের এই হয়রানি থেকে রক্ষা করা, ভুলক্রমে কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া, এক সঙ্গে বহুল বিতর্কিত এই আইনটির ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রকৃত অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় নিয়ে যাওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেছেন "৩৫ বছরের জঞ্জাল দূর করার জন্য বর্তমান জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। শত্রু সম্পত্তি

www.pathagar.com

আইন নামের বৈষম্যমূলক ও বর্বরোচিত এ আইন শুধু সংখ্যালঘুদের নয় সংখ্যাগুরুদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই এ সাম্প্রদায়িক জঞ্জাল দূর করতে সবাই আজ একমত।"

সুরঞ্জিত বাবুর এ বক্তব্যের সাথে আমরাও ঐকমত্য প্রকাশ করে বলছি এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত মানসে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় স্বৈরশাসক আয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত যে নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আইনটি একটি অধ্যাদেশ থেকে ১৯৭৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংসদীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে তিন দশকেরও অধিককাল ধরে এদেশের কয়েক লাখ হিন্দুকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে এবং এদেশে বসবাসকারী আনুমানিক ১০,৪৮,৩৯০ টি পরিবারের প্রায় ১০ লাখ একর (সরকারি হিসাবে প্রায় ৮ লাখ একর) জমি এই আইনের আওতায় এনে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে নিঃস্ব রিক্ত ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত করেছে, সেই আইন বাতিলের নামে যেন তাকে সংশোধন করে আরো জটিল করার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থহানির পথকে প্রশস্ত করা না হয়।

অতঃপর আর একটি কথা বলে আমার এ লেখা শেষ করবো। গত চার বছর ধরে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়েও আওয়ামী লীগ সরকার শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করেনি। তাদের শাসনকালের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে এইমাত্র সেদিন সংসদীয় কমিটিতে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত বিলটিতেও কেবলমাত্র কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যেই নজিরবিহীনভাবে মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ কমিটিতে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে অথচ আওয়ামী সরকারের একান্ত বংশবদ ও চাটুকার কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন আওয়ামী লীগকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে। এসব খোশামুদে চাটুকারদের কার্যকলাপ দেখে একটি গল্প মনে পড়ছে।

অধর চন্দ্র নামে এক পাগল ছিল। লোকে তাকে অধরচন্দ্র না বলে "অধারা" পাগল বলেই ডাকতো। অধর অবশ্য তার নামের এ বিকৃত উচ্চারণে কোনো প্রতিবাদই করতো না। পাগল হলেও অধরকে সবাই ভালোবাসতো। এর কারণ অবশ্য অধরের বেগার খাটা স্বভাব। অধরকে কেউ কোনো কাজ করতে বললে সে খুশিমনেই তা করে দিত, বিশেষ করে গৃহিণীরা তাকে কোনো কাজ করতে বললে অধর খুব বেশি খুশি হয়। না; কোন মজুরি অধর নিত না কেউ দিতোও না। মাঝে মাঝে এক থালা ভাত বা দুমোঠা মুড়ি দিলেই অধর বর্তে যেত। এই অধরকে একদিন দেখা গেল পাড়ার সম্পন্ন এক গৃহস্থের বাড়ির দেউড়ীতে বসে মুখ নেড়ে নেড়ে কি যেন চিবুচ্ছে। কৌতুহলী একজন জিজ্ঞেস করলে "অধরা কি খাচ্ছিস?" অধরের উত্তর "আজ্ঞে মুড়ি খাচ্ছি।" "মুড়ি?" কই তোর সামনে ধারে কোথাও তো মুড়ি দেখছি না। এবার একগাল হেসে অধর উত্তর দিল, আজ্ঞে বড় ঠাকরুন মুড়ি দিবেন বলেছেন। দিবেন বলছেন তাতেই মুড়ি চিবানো শুরু হয়ে গেছে? এবারও অধর একগাল হেসে বললো, আজ্ঞে বট্‌ঠকবুন যে!

www.pathagar.com

শত্রু সম্পত্তি আইন নিয়ে ধোকাবাজি

গত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে যেসব প্রত্যাশা জাগে তার অন্যতম হচ্ছে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের বিষয়টি। আইয়ুব খান কর্তৃক ১৯৬৫ সালে অর্ডিন্যান্স আকারে জারিকৃত এই কালো আইনটিকে আওয়ামী লীগ ১৯৭৪ সালে আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেও হিন্দুদের একান্ত বিশ্বাস ছিল আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় গেলে এই কালো আইনটি অবশ্যই বাতিল বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে হিন্দুরা প্রায় একচেটিয়াভাবেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল এ কারণেই কিন্তু ক্ষমতায় আসার ২ বছরের মধ্যেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে এবং তার তীব্র প্রকাশ ঘটে ১৯৯৯ সালে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কাউন্সিল অধিবেশনে ঐ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কাউন্সিলরদের তীব্র সমালোচনার মুখে শত্রু সম্পত্তিটিকে একটি কালো আইন হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে এ আইন বাতিল হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এরপরই শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের প্রশ্নটি বিভিন্ন মহলে আলোচিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আইনটি বাতিলের পদক্ষেপ হিসেবে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে আহবায়ক করে একটি সংসদীয় 'সাব-কমিটিস্ব গঠন করা হয়। এরপর বহু টালবাহানা ও কালক্ষেপণের পর গত ২১ আগস্ট '৯৯ তারিখে জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো'তে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের জন্য বিলের খসড়া তৈরী এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এই আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মনে নতুন করে আশা জাগে যে, অতঃপর অর্পিত সম্পত্তি আইনটি ঠিকই বাতিল হতে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে নিউইয়র্কে হোটেল গ্র্যাণ্ড হায়াতে অবস্থানকালে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু লোক সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দাবি-দাওয়া এবং তাদের কয়েকটি সমস্যা (যার মধ্যে সম্ভবত শত্রু সম্পত্তির বিষয়টিও ছিল) নিয়ে তার সাথে আলাপ করতে গেলে তিনি এসব দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। দেশের পত্র-পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে আবার হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ও নেতৃবর্গ বক্তৃতা বিবৃতিসহ বিভিন্ন প্রতিবাদী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে থাকেন। এর মধ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির এক বৈঠকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি সি, আর, দত্ত, সাধারণ সম্পাদক নিমচন্দ্র ভৌমিক, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে দেয়া বক্তৃতায় বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, শত্রু সম্পত্তি আইন অবিলম্বে বাতিল হলেই কেবল হিন্দু জনমনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে যে ক্ষোভ এবং বিভ্রান্তির দৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন হবে।

www.pathagar.com

সম্ভবত এই বক্তব্যের কারণেই বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর সরকার আবার এ সম্পর্কে তৎপরতা শুরু করেছেন। দৈনিক প্রথম আলো'র ৯ই নভেম্বর সংখ্যায় 'শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের বিল সংসদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হবে'–এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়; "ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় গতকাল (৮/১১/৯৯ইং) সোমবার বিলটির ওপর বিশেষজ্ঞদের দেয়া মতামত থেকে কিছু সংশোধনী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিলটি গতকাল সোমবার চূড়ান্ত করার কথা থাকলেও কমিটির বিএনপি সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে তা হয়নি। জানা গেছে, প্রস্তাবিত এ বিলটি সংসদীয় কমিটি চূড়ান্ত করার পর তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর বিলটি আইন মন্ত্রণালয় হয়ে সংসদে পেশ করা হবে। বিগত তিন বছরেরও অধিককাল হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে এর মধ্যেও বিলটি চূড়ান্ত না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু জনমনে এ আইন বাতিল হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এরপরও যদি এই কালো আইনটি বাতিলের ব্যাপারে নানা প্রকার অজুহাত ও প্রক্রিয়ার কথা তুলে আইনটি বাতিলের (সরকারের ভাষায় সংশোধন) ব্যাপারে অযথা টালবাহানা বা সময়ক্ষেপণ করা হয়, তবে তাকে নিছক হিন্দুদের সান্ত্বনা বা ধোঁকা দেয়া বলেই গণ্য করা হবে। ইতোমধ্যেই শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনটি বাতিল না করে তা সংশোধনের যে খসড়া বিলটি সরকার চূড়ান্ত করেছে বলে খবরে প্রকাশ পেয়েছে তাতে এ আইনের দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায় আশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে আশঙ্কিতই হয়েছে। ঘর পোড়া গরু অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। হিন্দু সম্প্রদায় দেখেছে অতীতে আইনটি যতবার সংশোধিত বা সংস্কৃত হয়েছে, ততবারই তা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে তাদের দুর্ভোগের মাত্রাকে বর্ধিতই করেছে। এবার তাদের আশা ছিল আইনটি সংশোধিত বা সংস্কৃত না হয়ে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাবে। বস্তুত এরকম আশ্বাসই তারা পেয়েছিল বর্তমান শাসক দলের পক্ষ থেকে। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই আশাই তারা পোষণ করেছে। এই স্বপ্ন, আশা এবং বিশ্বাস নিয়েই তারা '৯৬-এর নির্বাচনে প্রায় একতরফাভাবে ভোটও দিয়েছে আওয়ামী লীগকে। কিন্তু সংসদীয় কমিটির প্রস্তাব বা সুপারিশে তাদের সে আশা ও বিশ্বাসের আদৌ কোন প্রতিফলন ঘটেনি। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "শত্রু সম্পত্তি আইনের অধীনে যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে ১৯৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারীর পূর্বে তালিকাভুক্ত করা হয়নি এবং এই তারিখের পরবর্তী সময়ে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে যেসব সম্পত্তি সরকারের দখলে নেই কিংবা উক্ত তারিখের পরবর্তী সময়ে যেসব সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকার তার দখল নিয়েছে ঐ সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না। এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত সম্পত্তিকে মূল মালিকের স্বত্ব, স্বার্থ দখল ঐ আইনের বিধানমতো পুনর্বহাল হবে। তবে অর্পিত সম্পত্তির রূল মালিকের কেউ বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকলে তার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না, বিদেশী নাগরিক তার পূর্ব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। এ সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট ন্যস্ত হবে।

উদ্ধৃত প্রস্তাবে দেখা যায়, ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালেল ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তালিকাভুক্ত এবং সরকারের দখল নেয়া সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই মূল মালিকের কাছে প্রত্যার্পিত হবে না। অর্থাৎ এগুলো সরকারের হাতেই থেকে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু কেন? ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তানের জরুরি অবস্থা বহাল থাকাই কি এর একমাত্র কারণ? তাহলে কি ওই ১৯৬৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আইনটি বৈধ ছিল? একই আইনের দ্বারা তালিকাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই সময়গত বিভাজনের কারণ কি?

এরপরের প্রশ্নটি সম্পত্তির মালিকের নাগরিকত্ব নিয়ে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের শত্রু এবং তাদের পাকিস্তানস্থিত সম্পত্তিকেই শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। উক্ত আইনে শত্রু সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল–"Any individual who posses the natinality of a state at war with or engaged in military operation against Pakistan or having possessed such nationality at any time has lost in without acquring another nationality Or (b) any body or persons constituted or incorporated in or under the laws of such sate" সুতরাং ১৯৬৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের পর যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাবদ্ধ হয়েছে সেগুলোর মালিক যে বিদেশী তথা ভারতীয় নাগরিক হবে এটাই ছিল স্বতঃসিদ্ধ এবং আইনসঙ্গত। কিন্তু শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ভারতীয় নাগরিকদের সম্পত্তি তালিকাভূক্ত করার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের অসাবধানতা, ভুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও দূর্নীতিপরায়ণতার কারণে এমন অনেক সম্পত্তিই শত্রু সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ঐ তালিকা মোতাবেক সরকার ১৯৬৫'র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯'র ১৬ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ সম্পত্তির দখলও নিয়েছে যেসব সম্পত্তির মালিক ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলেন এবং এখনও আছেন। এ ক্ষেত্রে ঐ মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা এ সম্পত্তি ফেরত পাবে কিনা? এ প্রশ্নটা উঠছে এ কারণে যে, প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫'র ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯'র ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তালিকাভুক্ত এবং সরকার কর্তৃক দখলীকৃত সম্পত্তি সরকারের দখলেই থেকে যাবে। প্রস্তাবিত আইনের বিলটির চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে, ১৯৬৯'র ফেব্রুয়ারী পর কোন সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকার কর্তৃক দখলীকৃত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে সব সম্পত্তি তার মূল মালিকের অধিকারে প্রত্যার্পিত হবে। তবে এক্ষেত্রে মূল মালিক বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবে ধরেই নেয়া হয়েছে যে, ১৯৬৯'র পর যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের সম্পত্তিও থাকতে পারে বা আছে। এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্যরকম, তথা এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ১৯৬৯'র পর অর্থাৎ ১৯৭০, ৭১, ৭২ বা ৭৩ এর পর কোন এক সময় শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং হয়তোবা এ কারণেই ৭৪ বা তৎপরবর্তীকালে কোন এক সময় তিনি দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন বা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বর্তমান আইনে উক্ত মালিকের সম্পত্তি কি প্রত্যার্পিত হবে এবং হলে কার কাছে হবে?

দ্বিতীয়ত, যদি এমন হয় যে, কোন মালিকের সম্পত্তি তিনি দেশে থাকা অবস্থায় ১৯৭৩, '৭৪, বা '৭৫ সালে শত্রু সম্পত্তি নির্ণয়কারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ভুলে বা অসদুদ্দেশ্যক্রমে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ব্যাপারটা হয়েছে মালিকের অজান্তে এবং তিনি সম্পূর্ণ সরল হিসেবে সে সম্পত্তি বিক্রি করে বিদেশে চলে

www.pathagar.com

গিয়েছেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে উক্ত ক্রেতা ক্রয় সূত্রে উক্ত সম্পত্তি ফেরত পাবে কিনা? এক্ষেত্রে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শত্রু অর্পিত সম্পত্তি আইন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ই। আর হিন্দুদের দেশ ত্যাগের এ ঘটনাকে বলা যায় একটি সদা চলমান প্রবাহ। ১৯৪৭ সাল থেকে এ প্রবাহের শুরু এবং এখনও তা অব্যাহত। বিগত কয়েক দশকের আদমশুমারীর রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের এই ঘটনাটির বাস্তবতা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হবে। আদমশুমারীর রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১২.১ জন, ১৯৯১ তে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০.৫ জনে অর্থাৎ এক দশকে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ২ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৮১ থেকে ১৯৯তে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় ৩ শতাংশের মতো।

আরো দুই দশক পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার হার ছিল শতকরা ১৮.৫। তাই দেখা যায়, ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ এই তিন দশকে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৮ শতাংশেরও বেশি।

যথেষ্ট গরমিল যুক্ত সরকারি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে প্রায় ৫০ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ আমলেই দেশ ত্যাগ করেছে। ১৯৯১ সালের জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর সাপ্তাহিক 'হলিডে' এক অনুসন্ধানী জরিপে দেখিয়েছিল যে, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করেছে। অনেক গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের নানাবিধ কারণের মধ্যে শত্রু সম্পত্তি আইনটিকে অন্যতম কারণ এবং ১৯৬৫ সালের পর হিন্দুদের দেশ ত্যাগের প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই বাস্তবতার কারণে আজ তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে সমস্ত হিন্দু শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি নামক এই কালো ও নিপীড়ন নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আইনের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের কারণে ভিটে-মাটি হারিয়ে দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব নিতে বাধ্য হলো, আজ সেই আইন বাতিলের নামে নানা প্রকার বিধি-বিধান ও শর্ত আরোপ করে সেইসব মূল মালিকদের বা তাদের ওয়ারিশদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা কি একান্তভাবেই অনৈতিক ও অমানবিক হবে না। বিষয়টি বিবেচনার জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ রাখছি।

প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, "৩৫ বছরের জঞ্জাল দূর করার জন্য বর্তমান জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। শত্রু সম্পত্তি আইন শুধু সংখ্যালঘুদের নয় সংখ্যাগুরুদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই এই সাম্প্রদায়িক জঞ্জাল দূর করার ব্যাপারে সবাই আজ একমত।

সুরঞ্জিত বাবুর এ বক্তব্যের সাথে আমরাও সম্পূর্ণ ঐক্যমত্য প্রকাশ করে বলছি-এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক জীবনকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত মানসে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত যে নিপীড়ন ও বৈষম্যমূরক আইনটি একটি অধ্যাদেশ থেকে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংসদীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে তিন দশকেরও অধিককাল ধরে

www.pathagar.com

এদেশের লাখ লাখ হিন্দুদের ভিটে-মাটি ছাড়া করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে এবং এদেশে বসবাসকারি আনুমানিক ১০,৪৮,৩৯০টি পরিবারের প্রায় ১০ লাখ একর (সরকারি হিসেবে ৮ লাখ একর) জমি এই আইনের আওতায় এনে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে নিঃস্ব-রিক্ত-ভূমিহীন ক্ষেত মজুরে পরিণত করেছে, সেই আইন বাতিলের নামে যেন তাকে সংশোধন করে আরো জটিল করার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থহানীর পথকে প্রশস্ত করা না হয়।

www.pathagar.com

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১
একটি আওয়ামী প্রতারণা

অবশেষে প্রায় তিন যুগ পর শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি নামক কালো আইনটি বাতিল হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ তার শাসনকালের অন্তিমসীমায় পৌছে তথা সপ্তম জাতীয় সংসদের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠার প্রাক্কালে ওই সংসদের গত অধিবেশনে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১' নামক একটি বিল পাস করিয়ে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল হয়েছে বলছে।

এমন একটা কিছু যে হবে বা হতে যাচ্ছে বিগত সংসদ অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে আওয়ামী লীগের একান্ত বশংবদ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বক্তৃতা, বিবৃতি এবং সর্বশেষ এ আইন বাতিলের দাবিতে পাতানো গণঅনশনের রিহার্সেল বা মহড়া দেখেই সেটা আঁচ করতে পারছিলাম। কারণ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে এ ধরনের একটা সান্ত্বনা পুরষ্কার দেওয়ার প্রয়োজন অন্তিমকালে আওয়ামী লীগের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ছিল।

বিলটি পাস হওয়ার সাথে সাথে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দসহ নামসর্বস্ব কয়েকটি হিন্দু সংগঠন যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি অভিনন্দনের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল তারা যেন এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় একান্ত উদগ্রীব হয়েই ছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে একটি ভিন্ন চিত্রও আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশের মনে এই আইনের মাধ্যমে হৃত সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে নানাপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে সে খবরও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। আইনটি পাস হওয়ার পরপরই বিশিষ্ট কলামিষ্ট শ্রী রণেশ মৈত্র এক নিবন্ধে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ' আইনটিকে হিন্দুদের চোখে ধোঁকা দেওয়ার একটি কৌশল হিসাবে অভিহিত কচ্ছেন।

শ্রী রণেশ মৈত্র আইনটি পাস হওয়ার পর যে আশংকা প্রকাশ করেছেন, অনুরূপ আশংকা আমি প্রকাশ করেছিলাম আইনটির খসড়া পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময়ই। ওই সময় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্তের এক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এক নিবন্ধে বলেছিলাম, "এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত মানসে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত যে নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আইনটি একটি অধ্যাদেশ থেকে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংসদীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে তিন দশকেরও অধিককাল ধরে এদেশে বসবাসকারী আনুমানিক ১০,৪৮,৩৯০ টি পরিবারের প্রায় ১০ লাখ একর (সরকারী হিসাবে ৮ লাখ একর) জমি এই আইনের আওতায় এনে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে নিঃস্ব, রিক্ত, ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরে পরিণত করেছে, সেই আইন বাতিলের নামে যেন তাকে সংশোধন করে আরো জটিল করার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থহানির পথকে প্রশস্ত করা না হয়।

www.pathagar.com

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন বিল ২০০১ পাসের মধ্য দিয়ে সেই আশংকাই সত্যে পরিণত হয়েছে। বস্তুত এই আইনের মাধ্যমে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তির একটি অংশমাত্র নানা সর্ত সাপেক্ষে এদেশের নাগরিক তথা অব্যাহতভাবে বসবাসকারী স্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন এবং এ আইনের মাধ্যমে তালিকাভূক্ত সকল সম্পত্তিকে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি হিসাবে যথারীতি বহাল রেখে কেবলমাত্র সেই সব সম্পত্তির একটা বিশেষ অংশ, যা উক্ত আইনের ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তা-ই কেবল এদেশে অব্যাহতভাবে বসবাসকারী স্থায়ী নাগরিকদের নিকট প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "The defence of Pakistan ordinance"-এর ১৮২ নং বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যে সব নাগরিক ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থান করছিলেন এবং ঐ তারিখ হতে ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ (জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের তারিখ) পর্যন্ত সময়ে ভারতে গমন করেছিলেন তাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং উহার ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক/উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত করা হয়। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার পর The enemy Property (Continuance of Emergency provision) ordinances's ১৯৬৯-এর বিধান অনুসারে শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বলবৎ রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ আদেশ বাতিল করে "The Emergency property (continuance of Emergency Provision) Act 1974" জারি করা হয় এবং এই আইনের ৩ ধারা মোতাবেক যেসব শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত হয়েছিল সেসব সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর বর্তায়।

উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র সেই সব সম্পত্তিই শত্রু সম্পত্তি হিসাবে গণ্য বা তালিকাভূক্ত হবে, যেসব সম্পত্তির মালিক ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন। কিন্তু এ রকম স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও ভুল ক্রমে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে বা অন্য যে কোনভাবেই হোক এদেশে বসবাসকারী নাগরিকদের অনেক সম্পত্তিও শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং সরকারের উপর বর্তেছে। বর্তমান অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইনে কেবলমাত্র এইভাবে ভূলক্রমে বা বলা যায় বেআইনীভাবে তালিকাভূক্ত সম্পত্তিসমূহকেই তার মূল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে "১৯৬৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভূক্ত করেছে, দখলে নিয়েছে এবং কিছু সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করেছে। সে প্রক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে এদেশের নাগরিকদের সম্পত্তিও তালিকাভূক্ত হয়েছে। তাই সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বজায় রেখে ন্যায় ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হয়ে থাকলে তা ফেরৎ দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে অর্পিত সম্পত্তি আইন এবং এই আইনে তালিকাভূক্ত সম্পত্তিকে যথারীতি বহাল রেখে, ইতিপূর্বে ওই আইনের আওতায় ভূলক্রমে বা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

www.pathagar.com

হয়ে এদেশের নাগরিকদের যেসব সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে, সেই বে-আইনী তালিকাভূক্ত সম্পত্তির একটি ভগ্নাংশমাত্র ফেরৎ দেওয়ার লক্ষ্যেই 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন আইন পাস করা হয়েছে।

কিন্তু এই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং অব্যাহতভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের যে সমস্ত সম্পত্তি ভূল ক্রমে তালিকাভুক্ত হয়েছে সেসব সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়ার বিধান করা হলেও আইনে একাধিক বিধিনিষেধ ও শর্তাবলী আরোপ করে সে ক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

ভুলক্রমে এবং বলা যায় সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের যে সব সম্পত্তি শত্রু তালিকাভুক্ত হয়েছে সেসব সম্পত্তি পুরোপুরি প্রত্যার্পণ না করে বর্তমান আইনে এসব সম্পত্তিকে এমনভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে এসব সম্পত্তির মূল মালিকরা তার এক নগণ্য অংশই মাত্র ফেরৎ পাবে।

যেমন আইনটির ৬নং ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না, যথা ঃ

উপধারা (গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারাই প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি।

উপধারা (ঘ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশ বিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তিঃ

উপধারা (ঙ) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি।

উপধারা (চ) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তি।

এইসব শর্ত ও বাধা-নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তির একটি ভগ্নাংশ মাত্রই যে মূল মালিককরা ফেরৎ পাবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

আইনের ৬ নং ধারার 'গ' উপধারার স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না করার যে বিধান রাখা হয়েছে তা সম্পত্তির এক বিরাট অংশ থেকে মূল মালিকদের বঞ্চিত করবে, কারণ স্থায়ী ইজারার ব্যাখ্যায় উক্ত আইনে বলা হয়েছে কৃষি জমির ক্ষেত্রে ১৫ বছর এবং অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ১২ বছরের উর্ধ্বকালীন ইজারাকেই স্থায়ী ইজারা হিসাবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, যে আইনটি সুদীর্ঘ তিন যুগ তথা ৩৬ বছর ধরে বলবৎ আছে এবং যে আইনে সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার বিধান আছে এবং ইজারা দেওয়া হয়েছে সেখানে অধিকাংশ সম্পত্তির ইজারার মেয়াদকালকে যথাক্রমে ১২ ও ১৫ বছর অতিক্রম করে গেছে এটাই স্বাভাবিক।

এরপর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ৬ ধারার 'চ' উপধারায় জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এরূপ কোন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণযোগ্য হবে না বলে যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে সম্পত্তির মূল মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ আইনে 'জনস্বার্থে' শব্দটির কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় কর্তৃপক্ষ শব্দটির ইচ্ছা মৌখিক ব্যাখ্যা করে মালিককে তার সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

বহুবিধ বাধা-নিষেধ ও শর্তাবলী কণ্টকিত এই আইনটিকে পর্যালোচনা করলে একে একটি কালা-কানুন রহিত করার নামে প্রণীত আর একটি অধিকতর নিপীড়নমূলক কালা-কানুন হিসাবেই আখ্যায়িত করা যায়। বস্তুত ক্ষমতার শেষ প্রান্তে এসে আওয়ামী লীগ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিলের নামে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' নামে এমন একটি নতুন আইন পাস করেছে যা অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের হৃত সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার পথকে সুগম না করে সে পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়ার পন্থাকেই প্রশস্ত করবে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন একদিকে যেসব হিন্দুদেরকে তাদের সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে তেমনি তাদের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রেও নতুন প্রশ্নের অবতারণা ঘটিয়েছে। এই আইনে সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে মালিককে কেবল বাংলাদেশের নাগরিক হলেই হবে না, তাকে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা এবং অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী হতে হবে। কারণ উক্ত আইনে ২নং ধারার 'ড' উপধারায় বলা হয়েছে কেবলমাত্র সেই মূল মালিক, তার উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারীই সম্পত্তি ফেরৎ পাবে যদি উক্ত মূল মালিক উত্তরাধিকারী বা স্বার্থাধিকারী অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হয় এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে নাগরিকত্বের জন্য অব্যহতভাবে বসবাসের আইনটি কি অপরিহার্য এবং এ শর্তটি কি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য? নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে বসবাসের শর্তটি একাধারে বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার ৪ নং অনুচ্ছেদ, যেখানে বলা হয়েছে–Every one has the right to leave any country including his own and to return to his country" পরিপন্থীও।

বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট দুই বছর আগে ১৯৯৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর হিউইয়র্কে প্রবাসী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তাদেরকে এক পা ভারতে এক পা বাংলাদেশে রাখা নাগরিক হিসাবে কটাক্ষ করে এবং সেই সাথে তাদের পুরোপুরি বাঙালি হওয়ার উপদেশ দিয়ে তাদের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা নিয়ে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বর্তমান অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে বসবাসের শর্ত আরোপ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি আর একবার সে সন্দেহ ও অবিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটালেন।

অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবির পাশাপাশি উক্ত সম্পত্তির মালিকের অনুপস্থিতিতে তা তার সহ-অংশীদার (কো-শেয়ারার) এর নিকট প্রত্যর্পণের দাবিও করা হয়েছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু বর্তমান আইনে মূল মালিকের অনুপস্থিতিতে তার সহ-অংশীদারকে সম্পত্তির সকল অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে সহঅংশীদার সম্পত্তির কোন দাবি করতে পারবে না–এক্ষেত্রে সম্পত্তি সরকারের খাস দখলে চলে যাবে এবং সহঅংশীদারকে সরকারের নির্ধারিত মূল্যে আর দশজন ক্রেতার মত ক্রয় করে নিতে হবে। বিধানটি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেআইনী না হলেও একান্তভাবেই অমানবিক।

পরিশেষে আর একটি কথা বলেই আমি নিবন্ধের শেষ করবো। এ নিবন্ধের শুরুতে আমি বলেছি আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতার শেষ প্রান্তে এসে অর্পিত (শত্রু)

www.pathagar.com

সম্পত্তি বাতিলের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে একটি নতুন আইন পাস করেছে। অথচ হিন্দুদের আশা ছিল ক্ষমতায় আসার পরপরই আওয়ামী লীগ তাদের আর্থ সামাজিক জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ এই বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক আইনটিকে বাতিল করবে। আওয়ামী লীগও তাদের নির্বাচন পূর্ব বক্তৃতা-বিবৃতি এবং আলাপ-আলোচনায় অনুরূপ আশ্বাসই দিয়েছিল।

কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আইনটি বাতিলের ব্যাপারে ক্রমাগত গড়িমসি টালবাহানা ও কালক্ষেপণ করতে থাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে আইনটি বাতিলের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের আগ্রহের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস ও সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে এবং এ ব্যাপারে তাদের মনে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। বিভিন্ন সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে। এ ক্ষোভের প্রকাশও তারা করতে থাকেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ আইনটি বাতিলের ব্যাপারে কালক্ষেপণই করতে থাকে, কিন্তু কেন? নিশ্চিত ভোট ব্যাংক বলে কথিত হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ক্ষোভ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের এই কালক্ষেপণের যুক্তিসংগত কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতঃপর গত এপ্রিল মাসে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাস হওয়ার পরই এই টালবাহানা ও কালক্ষেপণের কারণ বোঝা গেল।

বস্তুত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনটি যতটা না শত্রু সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত সম্পত্তি হিন্দুদের অনুকূলে ফেরৎ দেওয়ার জন্য করা হয়েছে তার চাইতেও এ সম্পত্তি থেকে তাদেরকে চিরতরে বঞ্চিত করার জন্যই করা হয়েছে। এখানেই রয়েছে শুভংকরের ফাঁক। এ ফাঁকি আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং সজ্ঞানেই দিয়েছে এবং এ কারণেই ক্ষমতার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে এই প্রতারণামূলক আইনের প্রণয়ন। কারণ আওয়ামী লীগ জানে আইনের এই ফাঁকি এবং ঘোরপ্যাচ এক সময় প্রকাশ পাবেই। তবে তার আগে শত্রু সম্পত্তি আইন আওয়ামী লীগ বাতিল করেছে এই মোহে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংককে আচ্ছন্ন করে রেখে আওয়ামী লীগের ভোট বাক্স পূর্ণ করার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় এ আইনের প্রবর্তন।

www.pathagar.com

সাংবিধানিকভাবেই হিন্দুরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক

গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ ঢাকার জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠে সনাতন ধর্মের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ ধর্মীয় আলোচনা যেমন করেছেন তেমনি তার পাশাপাশি একান্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্রমাবনতির যে স্বাধীনতার পরও অব্যাহত রয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও দ্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তারা এও বলেছেন যে, অব্যাহত সামাজিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অধিকার হারানোর প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন ৫৫০ জন হিন্দু দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন বা যেতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ না করে প্রতিদিন ৫৫০ জন হিন্দুর দেশ ত্যাগের এই বিষয়টিকে একটি বেদনাদায়ক তথ্য বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত সম্মেলনের পর প্রায় দুই মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে, ইতিমধ্যে প্রতিদিন ৫৫০ জন হিন্দুর দেশ ত্যাগের এই উদ্বেগজনক তথ্যটি সম্পর্কে সরকার, বিরোধী দল এবং বুদ্ধিজীবি মহলসহ কোন তরফ থেকেই কোন প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি। অর্থাৎ হিন্দু নেতৃবৃন্দের এ বক্তব্যটিকে প্রকারান্তরে সকল মহল থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমি প্রতিদিন ৫৫০ জন হিন্দুর দেশ ত্যাগ করে যাওয়ার বিষয়টিকে একটি উদ্বেগজনক বিষয় বলছি এজন্য যে, বর্তমানে হিন্দু জনসংখ্যা হচ্ছে ১,১১,৭৮,৮৬৬ জন (১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) এক্ষেত্রে প্রতিদিন ৫৫০ জন হিন্দু যদি দেশ ত্যাগ করে তবে প্রতিবছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে দেশত্যাগী হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০৭৫০ জনে। এর সাথে শতকরা ১ জন হারে মৃত্যু সংখ্যা যোগ করলে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১০৭৫০ জন। এর সাথে শতকরা ২ জন হারে জন্ম হারের প্রবৃদ্ধি যোগ করলেও দেখা যায় প্রায় ১ লাখ বা তার কাছাকাছি হিন্দু জনসংখ্যা প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ একদিন পুরোপুরিভাবে হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। বস্তুত এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন সনাতন ধর্ম সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ। কিন্তু সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ কেবল আশঙ্কাই প্রকাশ করেননি, সেই সাথে তারা এই সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের প্রবাহ বন্ধ করার উপায় হিসেবে সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ যেমন-শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল, রমনা কালীবাড়ির অধিগ্রহণকৃত জায়গা প্রত্যাবর্তন ও যথাস্থানে মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বেদখলকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা ও বেদখল হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ ইত্যাদিও পেশ করেছেন। উল্লেখিত সুপারিশসমূহ কার্যকর হলে অবশ্যই হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসবে এবং দেশ ত্যাগের প্রবণতাও হ্রাস পাবে-তবে এ প্রবাহ বন্ধ হবে না, কারণ এসব সমস্যা হিন্দুদের দেশ ত্যাগের মুখ্য নয় গৌণ কারণ মাত্র। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগের দীর্ঘকালীন প্রবাহ বন্ধ করতে হলে এ সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

www.pathagar.com

কোন দেশের জনগণের কোন বিশেষ অংশ বা গোষ্ঠীর দেশ ত্যাগের ঘটনা কেবলমাত্র সে সব দেশেই সংঘটিত হয় যেসব দেশে জনগণ ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, গাত্রবর্ণ ইত্যাদি কারণে সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত থাকে এবং বিভাজিত অংশের সংখ্যাগুরু অংশ যদি রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার অধিকারী হয় তবে সংখ্যাল্প তথা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পরিণত হয় সংখ্যাগুরুর নানা প্রকার শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচার আচরণের শিকারে। এর ফলশ্রুতিতে বৈষম্যপীড়িত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এক সময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের প্রতিবাদী আন্দোলনের পথ পদ্ধতি ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের ভৌগোলিক অবস্থানই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং সে আন্দোলন আঞ্চলিক শায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার দাবি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যদি কোনো বিশেষ এলাকায় একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তবে সেখানে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের আন্দোলন আঞ্চলিক শায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার দাবি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যদি কম বেশি হারে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে তবে সেক্ষেত্রে তাদের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তাদের জন্য বিশেষ বিধি বিধান প্রণয়ন তথা সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থাকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এ লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী তথা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর কঠোর মনোভাব এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং দমন-পীড়নে সংখ্যালঘুদের মনে যে হতাশা বোধের সৃষ্টি হয় তার থেকেই জন্ম নেয় দেশ ত্যাগের মানসিকতা। এক্ষেত্রে যদি পার্শ্ববর্তী বা প্রতিবেশী দেশ বা রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমসত্ত্বা বিশিষ্ট অর্থাৎ একই ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও নৃভাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তবে এই দেশ ত্যাগের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটিই ঘটছে।

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের মতো। শতকরা হিসাবে এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশেরও বেশি। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই এক-দশমাংশ জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হলেও তাদের জন্য কোন সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করে কার্যত তাদেরকে এক হতাশাগ্রস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।

বস্তুত কোন দেশের জনগণ যখন সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু অভিধায় অভিহিত হয়ে একই সংবিধানের আওতাধীনে বসবাস করে তখন উক্ত সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানবিদ ডঃ বি আর আম্বেদকরের ভাষায় "The constitution of the post war states as well as of the other states in Europe which had a minority problem proceed of the assumption that Constitutional safeguards for minorities should suffece for their protection and so the constitution of most of the new

www.pathagar.com

states with majorities and minorities were studeed with a long list of fundamental rights and safeguards to see that they were not violated by the majorities.

কোন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ এবং অস্তিত্বের নিরাপত্তার জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের যথার্থতা পাকিস্তানের আন্দোলনের ভিত্তি বলে কথিত লাহোর প্রস্তাবেও মেনে নেয়া হয়েছিল। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল–"That adequate, effective and mandetory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in the unites and in the regions for the protections or their religious, coltural, economic, political, administrative and other rights and interest in consultation with them.

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে সংখ্যালঘু বিশেষ করে অনুন্নত অনগ্রসর হিন্দু তফসিলী সম্প্রদায় এর আর্থসামাজিক ও শৈক্ষিক উন্নয়নের জন্য কতিপয় বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে উক্ত সংবিধান বাতিল করে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান যে সংবিধান জারি করে তাতে সংখ্যালঘুদের যতটুকুও বা অধিকার পূর্বে দেয়া হয়েছিল তাও নস্যাৎ করে দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের নাগপাশ মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে ১৯৭২ সালে যে সংবিধান গৃহিত হয় তাতে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতির অন্যতম মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করার অজুহাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। বিস্ময়কর ও দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের ইসলামী রাষ্ট্র সংঘের সদস্য পদ গ্রহণ এবং সেই সাথে সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিলোপ এবং ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণার পরও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি এবং তাদের অনুকূলে কোন বিশেষ বিধি বিধান বা রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও করা হয়নি-যার ফলশ্রুতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনে যে হতাশা ও হীনম্মন্যতা বোধের সৃষ্টি হয়েছে তারই পরিণতিতে তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশ ত্যাগের প্রবণতা। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের স্রোত বন্ধ করতে হলে তাই প্রথমেই সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণ তথা কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ এক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্রটি অত্যন্ত প্রকট ও দৃষ্টিকটু। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগেরও নিচে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলেও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রতিনিধিত্বের শতকরা ৩৩ ভাগ থেকে ৫ ভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই হার আরও কম, বলা যায় প্রায় শূন্যের কোঠায়।

www.pathagar.com

সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের এই দুর্বলতম অবস্থান একদিকে তাদেরকে যেমন প্রশাসনে অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে তেমনি তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। কারণ আমাদের দেশে সরকারি চাকরি আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টিরও এক শক্তিশালী মাধ্যম। সরকারি চাকরিতে সংখ্যানুপাতিক অংশীদারিত্বের অভাব সংখ্যালঘুদের আর্থিক জীবনকেই কেবল পঙ্গু করেনি তাদের হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতার দ্বারাও আচ্ছন্ন করেছে। বস্তুত আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সরকারি চাকরি মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীকও বটে। চাকরির ক্ষেত্রে ন্যায্য অংশ কোন জনগোষ্ঠীর মনে দেশ সেবায় অংশগ্রহণের একটা অনুভূতি জাগাতেও সাহায্য করে। এ অবস্থা তাদের মনে প্রশাসনে অংশীদারিত্ববোধ সৃষ্টিসহ দায়িত্ববোধও সৃষ্টি করে। অনুন্নত পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপার হয় তখন তার আর্থিক সুবিধা মাত্র তার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক বিচারে এর ফলে গোটা সমাজটাই মর্যাদাবান হয়ে ওঠে। এমনকি এই ব্যক্তি তার সমাজের কোন উপকারে না এলেও ক্ষমতার দোর গোড়ায় নিজেদের লোক আছে এই অনুভূতি তাদের মানসিক বল বাড়িয়ে তোলে শতগুণ।

অনেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মৌলিক অধিকার লংঘন ও মেধাবীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চনা বলে মনে করেন। বাস্তবিক পক্ষে মেধা হলো প্রধানত অনুকূল পরিবেশের ফল। পরীক্ষাপত্রে উচ্চতর নম্বরের দ্বারাই পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষাগত ও সামাজিকভাবে অনুন্নত শ্রেণীর গ্রামীণ পরিবারের একটি ছেলে শহরের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে একই মাপকাঠিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। কাজেই মেধা এবং সমতাকে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। তাই পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলেদের যদি উচ্চতর সমাজের ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় তবে তাদের বিশেষ সুবিধাসহ সংরক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

অনেকে আবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সুবিধার দাবিকে একটি সাম্প্রদায়িক দাবি হিসেবে মনে করেন। কিন্তু বিষয়টি আদৌ তা নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীকে সমাজের অগ্রসর অংশের সমপর্যায়ে টেনে তোলার জন্য এটি একটি বাস্তব ও মানবিক দাবি। প্রশ্নটি কেবল রাজনীতির নয়-মানবিকতারও।

একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থিক, সামাজিক এবং শৈক্ষিক জীবনের মনোন্নয়নে সরকারের আনুকূল্য ও সাহায্য-সহযোগিতা সর্বতোভাবে অপরিহার্য। সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বহীন একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক বিশেষ বিধি-বিধানের। এই বাস্তব সত্যের উপলব্ধিতেই আমরা বার বার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সরকারি চাকরিতে জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণ বা কোটা ব্যবস্থার দাবি করেছি এবং করছি।

www.pathagar.com

'আইনের কাছে সকলেই সমান' সংবিধানের ২৯ নং এই ধারা প্রাথমিক মৌল অধিকার নিশ্চিত করেছে ঠিকই, কিন্তু সমতা নীতি দু'মুখো ধারালো অস্ত্রের মতো। কারণ এতে সরল ও দুর্বলকে জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় একই সরলরেখায় স্থান দেয়া হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচারের এই ভিত্তিতে শুধু সমান মানুষের সমতা নিশ্চিত করবে। অসমানকে সমান রূপে মৌখিক স্বীকৃতি দানের অর্থ হলো অসম্য চিরস্থায়ী করে রাখা। বস্তুত কোন সমাজ তার দুর্বলতর অবহেলিত ও পশ্চাদপদ অবহেলিত অনগ্রসর মানুষকে কি মাত্রায় সংরক্ষণ দেয় তার দ্বারাই সেই সমাজের বিচার করা হয়।

দুর্বল ও সবলকে একই অবস্থানে রেখে যদি সমান সুযোগ ও সমান ব্যবহার করা হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় দুর্বলকে সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা। আসলে সমান সুযোগ নয়, সমান ফল লাভই ন্যায় বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিৎ। নতুবা অসম সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগের নীতির প্রয়োগ বঞ্চনারই নামান্তর। সমাজে দুর্বলকে সবলের শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে দুর্বলের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন স্পীকার মনসুর হাবিবুল্লাহ সম্প্রতি এক নিবন্ধে বলেছেণ–"চাকরি সংরক্ষণের প্রশ্ন, তা সে যে লোকের জন্যই হোক না কেনো আসলে তা সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্ন। মুখে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি, বিভেদের মধ্যে, বৈচিত্রের মধ্যে মিলন এসব ভাল ভাল কথা বলে সামাজিক অন্যায় প্রতিরোধ করা যায় না।

সামাজিক অন্যায়, অবিচার এবং সমাজ ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সমবেদনা বোধের অভাব নাগরিকদের সংখ্যাল্প তথা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনে যে হতাশা ও হীনম্মন্যতা বোধের জন্ম দেয় তার থেকেই সৃষ্টি হয় দেশ ত্যাগের প্রবণতা। সে প্রবণতাকে রোধ করতে হলে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংখ্যালঘুদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়ে তাদের মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি। বস্তুত কোন দেশে কেবলমাত্র জন্মগ্রহণ করলেই কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর কাছে দেশটি স্বদেশ হয় না-যদি না সে দেশের গঠন, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তার অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকে–না থাকে শরিকানা বা মালিকত্ব বোধ। আর এ বোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে অনুভব করতে হবে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যর মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তথা সারাদেশের মঙ্গল নিহিত। কোথাও যদি কোন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার প্রতিকার করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠকেই। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদেরকেও বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের সুখ-সুবিধা বা সুযোগ পাওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনা ও বোধের উপরই নির্ভর করতে হবে। কোন তৃতীয় পক্ষ সুযোগ করে দেবে না। বস্তুত সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা এবং মানবিক উদারতা ভিন্ন কেবলমাত্র আইনের নিরাপত্তা দ্বারা সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সংখ্যালঘুর নাগরিক অধিকার ও

www.pathagar.com

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনতার ভূমিকা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য। তার ভাষায়–Rights are protected not by law but by the social and moral conseience of society. Social conseionce is such that it is prepared to recognise the rights which choose to enact rights will be safe and secure. But if the fundamental rights as opposed by the majority community no law, no parliament, no judicrary can gurantee them in real sense of the word.

আর একটি কথা বলেই আমি এ নিবন্ধের শেষ করবো। ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ যেমন কোন এক বিশেষ কারণে, বিশেষ দিনে সৃষ্টি হয়নি-তেমনি কোন একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন বা বিশেষ বিধান জারি করে দেশ ত্যাগের এ স্রোত বন্ধ করা যাবে না। দীর্ঘ কয়েক যুগের সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করতে অন্তত কয়েক বছর লাগবে। কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্র, সমাজ, তথা সরকার, বিরোধী দল, প্রশাসন, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সকলে মিলে নিরলস ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে-জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, প্রশাসন তথা জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে তাদের জন্য যথাযথ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে তাদের মন থেকে সকল প্রকার হীনম্মন্যতা বোধ দূরীকরণের-তবেই একদিন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বপ্রকার দূর্বলতামুক্ত জাতীয়তাবোধের সেদিন "Hindus world cease to be hindes and Muslims world cease to be Muslim not is the religious sense, because that is the personal faith of each Individual but in the political sense as eitizens of the state."

হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের দীর্ঘ প্রবাহমান স্রোত নিরুদ্ধ করার এটাই একমাত্র পথ।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের উপর সাংবিধানিক নির্যাতন

একটি দেশের সংবিধান হচ্ছে তার জনগণের অধিকার ও ক্ষমতার ভিত্তি এবং উৎস ভূমি। সকলস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংবিধানই নাগরিকদের সকল অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। বিশেষ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত রাষ্ট্রে সংবিধানই অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার পথ প্রশস্ত করে। বিশিষ্ট সংবিধানবিদ ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বি আর আম্বেদকরের ভাষায় "সংবিধানকে মনে করা হয় একটি দেশের পবিত্রতম দলিল যা তার সমস্ত নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের সর্বোচ্চ সনদপত্র (Magna Carta) সংবিধান একটি রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের নির্ধারক এবং সে সাথে "একটি দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থান, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাও নির্ধারিত হয় সংবিধানের মাধ্যমেই।

"The constitution is supposed to be a sacred document and the magnacarta of the hopes and aspiration of the entire population of a state. It sets the parameter of the states, its principles, ideology and more inportantly it enshrines the rights and privileges of its citizens. The positioning of minoition within a state is also determined the space and recognition given to them in the constitution."

বিস্ময়কর বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সাড়ে বারো শতাংশ মানুষ সাংবিধানিকভাবে ঘোষিত রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২১টি নৃতাত্ত্বিক উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও সংবিধানে এদেরকে ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু-এর কোনটা হিসেবেই স্বীকার করা হয়নি। এই অস্বীকৃতির কারণ হিসেবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে ঘোষণা করার কথাই বলা হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোন রক্ষাকবচ বা সংরক্ষণ ব্যবস্থা নাকি রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ভারতসহ বেশ কিছু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধানে সে দেশের অনুন্নত অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য যে সমস্ত বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে তার উল্লেখ করে এ যুক্তির অসারতা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিলোপ এবং পরবর্তীকালে ৮ম সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার পরও কি ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ইসলাম ধর্মের বাইরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুত্বের অস্বীকৃতি জানানো যায়? বস্তুতঃ সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর

www.pathagar.com

মধ্যদিয়ে এ দেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী যে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাথে পরিহাস এবং রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি বলেই আখ্যায়িত করা যায়। বাস্তবে সংখ্যালঘু অথচ সাংবিধানিকভাবে সংখ্যালঘুদের জন্য অপরিহার্য রক্ষাকবচসমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, আজ বাস্তব অর্থেই অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত। কারণ জাতিগত, ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ একান্তভাবেই প্রয়োজন। সমস্ত গণতান্ত্রিক সংবিধানই এ ব্যাপারে কমবেশী প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেছে। একমাত্র কর্তৃত্ব পরায়ন সমাজেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, এ ধরনের সমাজে সংখ্যালঘুদের অধিকার অস্বীকার করে জাতিগত বা ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের পক্ষে বিশেষ ধরনের রক্ষাকবচ বা জামিনদারী ছাড়া বিকশিত হতে পারে না।'

বিষয়টিকে নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আরো বিশদভাবে বলেছেন পাকিস্তানের জনক কায়দে আযম মোহাম্মদী আলী জিন্নাহ। তার ভাষায় 'প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার অর্থই হলো সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শাসন' তাই সংখ্যালঘুদের মনে আশংকা যে সংখ্যাগুরুরা এ অবস্থায় কি করবেন? এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের পীড়নকারী হবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মানুষকে উন্মত্ত করে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক সংবিধানসঙ্গত যে কোন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। একাধিক দেশের সংবিধানের নজির উল্লেখ করে তিনি বলেন 'সংখ্যালঘুরা সর্বদা সংখ্যাগুরুদের আতঙ্কে দিন যাপন করে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা সচরাচর নিপীড়ন ও অত্যাচারী হয়। সুতরাং সংবিধানিক নিরাপত্তা দাবী করার অধিকার সর্বদাই আছে।'

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য সাংবিধানিক বিশেষ বিধি-বিধান ও রক্ষাকবচের কথা বলতে হলে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। এ কথা সকলের জানা যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক তথা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় জীবনের সকলস্তরে প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তার সমস্যাই প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় এবং এ সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ পন্থা হিসেবে অখণ্ড ভারতবাদী কংগ্রেসকে অবশেষে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ তথা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমি গঠনের দাবি মেনে নিতে হয়। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

কিন্তু কংগ্রেস ও মুসীলম লীগ ধর্ম ভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগে সম্মত হলেও এ তত্ত্বের একান্ত যৌক্তিক পরিণতি ধর্মভিত্তিক জনহস্তান্তর বা জন বিনিময় পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই উল্লেখযোগ্য সংখক সংখ্যালঘু (ভারত বর্তমানে যে সংখ্যা ১২ কোটির মত এবং বাংলাদেশে প্রায়ই ২ কোটির মত) এ থেকে যেতে বাধ্য হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭

www.pathagar.com

সালের ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পর পরই কল্পনাতীত নৃশংসতার মধ্যদিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমান এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুদের মধ্যে দেশ ত্যাগ সম্পন্ন হওয়ায়, পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা আপাত সমাধান হলেও পূর্ব পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নানা প্রকার প্রশাসনিক নিপীড়ন নির্যাতন সত্ত্বেও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে দেশ ত্যাগ না করায় এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা পূর্ববৎই বহাল থাকে।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও ধর্ম ভিত্তিক জন বিনিময় যে সম্ভব হবে না এ সম্পর্কে ভারত এবং পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের পূর্বাহ্নেই ধারণা ছিল এবং সে কারণেই পাকিস্তানের ভিত্তি বলে কথিত লাহোর প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল।

সংখ্যালঘুদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের কথা বলতে গিয়ে উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "যেসব অঞ্চল বা এলাকা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে সেসব অঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সাথে আলোচনাক্রমে সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকরি ও নির্দেশনাত্মক বিশেষ রক্ষাকবচসমূহের ব্যবস্থা করা হবে।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৯ বৎসর পর যখন পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হলো তখন লাহোর প্রস্তাবের এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত, অনগ্রসর তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও শৈক্ষিক উন্নতি ও চাকরির নিশ্চয়তার জন্য উক্ত সংবিধানে নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সন্নিবেশিত করা হলো। বলা হলো-'রাষ্ট্র কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক সরকারের চাকরিতে সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তাসহ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করবে।'

অনুন্নত অনগ্রসর ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের শৈক্ষিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আরো বিশদভাবে বলা হলো–'রাষ্ট্র অনুন্নত অঞ্চল, অনগ্রসর শ্রেণী এবং তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের শৈক্ষিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নসহকারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।'

এরপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ নং ধারায় আরো বলা হলো –'পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার বিশেষ যত্নসহকারে অনুন্নত শ্রেণী এবং তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিধান করবে এবং তাদেরকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে', (ধারা–২০৫)।

২০৬ নং ধারায় বলা হয়–'পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি অণগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের অবস্থা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করবে, যে কমিশন অনগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের অবস্থা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করবে, যে কমিশন অনগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার সুপারিশসমূহ পেশ করবে।'

www.pathagar.com

এরপর ২০৬ নং ধারার অধীনে নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশসমূহ যাতে কার্যকর হয় তার জন্য ২০৬ নং ধারার ২ নং উপধারায় বলা হয়–"২০৬নং ধারা ১ নং উপধারার অধীনে নিয়োজিত কমিশন তার উপর অর্পিত তদন্তের বিষয়সমূহ তদন্ত করে রাষ্ট্রপতির বরাবরে তার সুপারিশসমূহ যা কমিশন উপযুক্ত মনে করে তা পেশ করবে এবং রিপোর্টের কপি জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে উপস্থাপন করবে।' তফসিলী সম্প্রদায় ও অনুন্নত শ্রেণীসমূহের জন্য প্রদত্ত এ সমস্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচসমূহ যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ২০৭ নং ধারায় একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ধারায় বলা হয়, তফসিলী সম্প্রদায় ও অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন বিশেষ কর্মকর্তা বা অফিসার থাকবে। এই বিশেষ কর্মকর্তার বা অফিসারের দায়িত্ব হবে তফসিলী সম্প্রদায় ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য যে সমস্ত রক্ষাকরার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কতদূর কার্যকর হয়েছে তার তদন্ত করা এবং এ সম্পর্কে তার মতামত রিপোর্ট আকারে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা যা রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদে উপস্থাপন করবেন।"

উদ্ধৃত ধারাসমূহের আলোকে দেখা যায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলেও সংখ্যালঘু বিশেষ করে অনুন্নত অনগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও শৈক্ষিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই সংবিধান কার্যকরভাবে প্রযুক্ত হবার আগেই পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সংবিধানকে বাতিল করে দেয়া হয়।

অতপর ১৯৬২ সালের সামরিক একনায়ক আয়ুব খান পাকিস্তানে এক নতুন সংবিধান চালু করে। এই একনায়কতন্ত্রী সংবিধানে ইতোপূর্বেই ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল তাকে যে শুধু নস্যাৎই করা হলো তাই নয়, অধিকন্তু সংখ্যালঘুদের সকল রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে রাষ্ট্রের জিম্মি বা আমানত হিসেবে ঘোষণা করে তাদেরকে পুরোপুরি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হলো।

গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কোন সময়েই সুখ-শান্তি বা নিরাপত্তাবোধ করেনি। কিন্তু আয়ুবীয় শাসনামলে তাদের জীবনের সকলক্ষেত্রেই ধ্বস নামে অতিদ্রুতগতিতে। এই পর্বেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় আয়ুবের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের দুই দুইবার যে নির্বাচন হয় তাতে তিনজন মাত্র হিন্দু পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হতে পেরেছে। পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার সাথে তুলনা করে এই হার মাত্র শতকরা একভাগ। এই সময়ে হিন্দু জীবনের সর্বাত্মক বিপর্যয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে গোলাম কবীর তার 'মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ' নামক বইতে উল্লেখ করেন–'পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা সবচেয়ে বড় নির্যাতনের শিকার হলেন সামরিকজান্তার হাতে। আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের 'রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করে দিলেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকে, পঙ্গু করে দিলেন ('Off all regims in Pakistan, it was Ayub Martial law regims which was must resented by the minorty Community

www.pathagar.com

During the Ayub regims the Hindus were on the retreat and were almost wiped on Politically. In order to Legitimize its seijure of Power, The new region blamde the Politicians for bringing Pakistan to the brink of disaster, charges of corruption and misconduct were levelled by the regime against former minister and politicians, the charges against hindu Politicians invariably included subversive activities and their alleged association with anti Pakistan organisation and elements.

At the initial stage of Martial Law Rule those Hindu leaders who were not Put in prison cells were subjected to considerable harrasment. The houses of Prominent Hindu leaders were often watched and surrounded by intelligence people thus restricting their movement. this had a very negative effects on ordinary Hindus....the morale of Common Hindus deteriorated.

The economic opportunities of the minorities were squeezed greatly during Ayub regime. They were discriminited against in the matters of granting import-export licence. The existing hindu enterprises also faced difficulty when the question of renewal of the Government sanction arose. Some hindu concerns including the Chitta Ranjan cotton mills were taken over by the Government for alleged mismannagement which allowed to continue would resume in loss of production off essential commodities. The policies of the regime caused a fresh wave of immigration to India. (গোলাম কবীর Minority Politics in Bangladesh 66-68

অভূতপূর্ব গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আয়ুবের এই স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে ১৯৬৯ সালে। আয়ুবের অপসারণের পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে দ্রুতগতিতে।

অতঃপর লাখ লাখ মানুষের আত্মাহুতি, ১ কোটি মানুষের দেশত্যাগ আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দুই যুগব্যাপী পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করে অভ্যুদয় ঘটে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের।

১৯৭২-র ১০ জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানী দুঃশাসনের অবসান এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথ্যে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের উন্মত্ততা আর বুক ভরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরসমূহ থেকে দেশে ফিরে আসেন ৭১'র ভয়াল দিনগুলোতে পাকবাহিনী আর রাজাকার, আল-বদরদের দ্বারা বিতাড়িত এক কোটি হিন্দু শরণার্থী। শুরু হয় নতুন জীবন আর নতুন যুগের। লুণ্ঠিত ভস্মীভূত শশ্মান সমতুল্য শূন্য ভিটায় এক

www.pathagar.com

কোটির মত নিঃস্ব রিক্ত সহায় সম্বলহীন হিন্দু সম্প্রদায় নতুন দিনের স্বপ্ন, সামনে সোনালী দিনের সোনালী আহ্বান। ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশে ফিরেই শেখ মুজিবুর রহমান নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিলেন। ১৯৭০'র নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করলেন গণপরিষদ। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই গণপরিষদ প্রণয়ন করলো নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা যার মূলনীতি। চারটি মূলনীতি রক্তসঞ্চিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে বাংলাদেশের এই সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে হিন্দু সদস্যদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। গণপরিষদের মোট হিন্দু সদস্য ছিলেন মাত্র ১০ জন। শতকরা হিসেবে যা ৩.৩ শতাংশ মাত্র। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে এই ১০ জনের মাত্র একজনকে মনোনীত করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করলে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র সংখালঘু সদস্য ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল সংবিধানে বাংলাদেশের অনগ্রসর তফসিলী সম্প্রদায় ও উপজাতিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষাসহ তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে হস্তলিখিত সংবিধানে গণপরিষদের সকল সদস্য স্বাক্ষর করলেও তৎকালীন বিরোধী দলের একমাত্র সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ঐ সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

এই সংবিধানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এমন কি অনুন্নত অনগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য কোন বিধান সন্নিবেশিত না হলেও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ সংবিধানকে অভিনন্দিত করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দুই যুগ ধরে যে রাজনৈতিক অধিকার তথা সম-নাগরিকত্বের মর্যাদা লাভের জন্য সংগ্রাম করছিল ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসেবে গ্রহণের মধ্যে তারা তা প্রাপ্তির পথ দেখেছিল। এই সংবিধানের ১২নং ধারায় ধর্ম ভিত্তিক তথা সাম্প্রদায়িক দল গঠন ও ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি করা সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এ ব্যবস্থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলের এক দৃঢ় এবং বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবেই মনে করেছিল। এ ক্ষেত্রে একটি কথাবলা আবশ্যক যে, ধর্ম নিরপেক্ষতা হিন্দুদের চোখে ধর্মহীনতা নয়-সকলের ধর্ম পালনের সমঅধিকার। এটা তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমমর্যাদার স্বীকৃতি, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকারের প্রতীক। কেবলমাত্র ধর্মের কারণে রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় জীবনের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার না হওয়ার নিশ্চয়তা। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদেশ হিসাবে গ্রহণ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠির জন্য কোন তাৎপর্য বহন না করলেও এই নীতি

www.pathagar.com

দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সাংবিধানিক সমমর্যাদার গ্যারান্টি- দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মমতার স্বাক্ষর।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তি এবং শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মনে যে আশা-আকাঙ্খা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাত্র ৫ বছরের মধ্যে তা বিলিন হতে শুরু করে।

সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভূক্তি সংখ্যালঘুদের সম-নাগরিকত্বের যে অধিকার দিয়েছিল, ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণা পত্র আদেশ নম্বর ৪-এ, ২য় তফসিল দ্বারা সেই ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ ঘটানো হয়। এরপর সংবিধানের ৮ম সংশোধনী আইন ১৯৮৮ সালের ৩০ নং আইন-এর ২য় দারা বলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের আবার পাকিস্তান আমলের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়। অনেকে সংবিধানের এই ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের পরিবর্তন এবং এর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করার জন্য যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা কি তাই? স্বাধীনতার উষালগ্নেই কি দেখা দেয়নি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিশ্বাসহীনতা? স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্মম শিকার ধন-সম্পদহারা ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের কি সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করতে পেরেছিল এ দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি? ক্ষমতাসীন তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কি গ্রহণ করেছিল এদের পুনর্বাসনের যথাযথ কার্যক্রমে? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ে "সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট" গ্রন্থের লেখক কংকর সিংহ বলেছেন, "সংখ্যালঘু শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন আর পুনর্বাসন নিয়েই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান। দেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর দিন থেকেই ভারত থেকে শরণার্থীদের ঘরে ফেরা শুরু হয়। ভারত সরকারই তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এই শরণার্থীদের শতকরা ৯০ ভাগই ছিল হিন্দু। দেশে ফিরেই তারা সমস্যার সম্মুখিন হন। কোথাও তাদের প্রত্যাগমন অভিনন্দিত হয়নি। তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বেদখল হয়েছিল। সব যে শুধু রাজাকার আলবদরদের দখলে দিয়েছিল তা নয়। স্থানীয় মুসলমানরা যারা ভয়-ভীতির মধ্যেও পাকিস্তানী দুঃশাসন মেনে নিয়েছিল তাদের হাতেও গিয়েছিল শরণার্থীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখল। বিশেষ করে গ্রামবাংলার এই সম্পত্তি পূণর্দখল করে যথাযথভাবে শরণার্থীদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া এবং তাদের নতুন সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসিত করার যে সমস্যা, তা থেকেই এ দেশে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা এতো প্রকট হয়ে ওঠে যে, এ থেকেই এ দেশের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়ে যায়। হিন্দু শরণার্থীরা ফিরে এসে তাদের পরিত্যক্ত সবকিছু দাবি করলো। শুরু হয়ে গেল নানা ধরনের প্রচার। এ দেশের বিশেষ কিছু পত্র-পত্রিকায় খবর উঠলো শুধুমাত্র একাত্তরে যে সমস্ত হিন্দু সীমান্ত অতিক্রম করেছে তারাই নয়, যারা সাতচল্লিশে, পঞ্চাশে, আটান্নতে, বাষট্টিতে, চৌষট্টিতে, পয়ষট্টিতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছে তারাও সব দলে দলে ফিরে আসছে। দাবি করছে তাদের

www.pathagar.com

পুরাতন সম্পদ। যে সমস্যা একাত্তরের অনেক আগেই চুকে-বুকে গিয়েছিল ভারত বাংলাদেশের জন্য সে সমস্যা নতুন করে তৈরি করছে। কোন কোন জায়গায় বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা ঘটলেও এ প্রচার সত্যি ছিল না। তবুও এ থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম হিন্দু বিরোধীতা শুরু হয়। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যে, শুধু মন্ত্রীদের নয়, শেখ মুজিবুর রহমানকেও বিবৃতি দিতে হলো যে, শুধুমাত্র একাত্তরের শরণার্থীদেরই বাংলাদেশে গ্রহণ করা হবে এবং যথাযথভাবে পুনর্বাসন দেয়া হবে।

শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়েই বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নিলো তা অল্প দিনের মধ্যেই উগ্র ভারত বিরোধিতায় রূপ নিলো। হিন্দু শরণার্থীদের পেছনে ভারত রয়েছে। এই মনোভাব থেকে প্রথম ভারত বিরোধিতার বীজ অঙ্কুরিত হলো। ভারত বাংলাদেশ থেকে সবকিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, এ দেশের হিন্দুরা ভারতকে সাহায্য করছে-এ প্রচার থেকে অল্পদিনের মধ্যেই সেই অঙ্কুরিত বীজ শাখা-প্রশাখা মেলতে আরম্ভ করলো; যাকে পরিচর্যা করার বহু লোক জুটে গেল দেশে।' স্বাধীন বাংলাদেশের এই ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পরই। এ সম্পর্কে Leonard G. Gordon তার "Divided Bengal : Problem of Nationalism and Identity in the 1947 Partition" নামক গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন, When I visited Bangladesh in June 1972 barely six months after what was still then called the war of liberation, suspicion against India was already high and it has continued to grow: at the same time Bangladesh has steadtly moved to ward normalization of relation with Pakistan and in creasing trade with what was West Pakistan. On a recent visit in August 1977, feeling against India still seem hostile and are spurred on by the prominent jounalist Enayetulla Khan in Holiday and the Bangladesh Time.

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ভারত বিরোধী এবং তার পরিণতিতে হিন্দু বিরোধীতার বর্ণনায় শ্রী কংকর সিংহ বলেন, "খুব অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকারী ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা রূপ নিলো বিরোধীতায়। বিদ্বেষের পথ ধরেই এলো সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু বিরোধীতা এবং ভারত বিরোধিতাকে সমার্থক করে তোলা হলো। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিকভাবে এবং সচেতন হয়ে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে পারল না। হয়তো চাইলও না। তারাও নিজেদের আখের গোছাতে চাইল।

দেশ রাহু মুক্তির দশ মাসের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা চরমরূপ প্রদর্শন করলো। ১৯৭২ সালের ১৪ অক্টোবর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত দূর্গা পূজা, হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। হিন্দুরা শত্রু নিধনের জন্য শক্তি রূপিণী দেবীকে বন্দনা করে, কামনা করে শত্রুমুক্ত বিশ্বের জন্য অপার শান্তি। কল্যাণ ও মঙ্গল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দুর্গা পূজা। পূজার দ্বিতীয় দিনেই ঢাকায় লাঞ্ছিত হলো হিন্দুদের মাতৃমূর্তি দূর্গা প্রতিমা। পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই সাথে এই ধরনের ঘটনা

www.pathagar.com

ঘটলো। রাজধানী ঢাকায় ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি তৎপর দেখা গেল এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে। পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন কারণে। কিন্তু কোন সময় হিন্দুদের কোন পূজা অনুষ্ঠানে প্রতিমাকে লাঞ্ছিত করা হয়নি–স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উদ্বোধন হলো অসুরনাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দেবী দুর্গাকে লাঞ্ছিত করার মধ্য দিয়ে।

হিন্দুরা কি করলো? প্রতিবাদ জানালো পূজার আলোকসজ্জা এবং আনন্দানুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে। মাতৃপ্রতিমা পর্দার আড়ালে ঢেকে, লাঞ্ছিতা প্রতিমা অসময়ে বিসর্জন দিয়ে।

বাংলাদেশের শুরুতেই সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর এই যে আঘাত পড়লো তা তাদের সমস্ত চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করলো দারুণভাবে। তারা সবচেয়ে বিচলিত হলো আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে। এ ঘটনার পিছনে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের হাত আছে বলে বলা হলেও এর জন্য সারাদেশে একজনকেও গ্রেফতার করা হলো না। এর ফলে একদিকে যেমন হতাশ হলো সংখ্যালঘু অন্যদিকে তেমনি সাহসী হয়ে উঠলো সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক গোষ্ঠী। এরপর সরকার কর্তৃক গৃহিত কিছু পদক্ষেপ তাদের এই সাহসকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেই চললো।

দুর্গামূর্তির এই লাঞ্ছনার আগেও আর একবার হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল রমনা রেসকোর্স মাঠে যা আজকের হোসরাওয়ার্দী উদ্যান, সেখানের পাকবাহিনী কর্তৃক গুঁড়িয়ে দেয়া রমনা কালীবাড়িকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে। প্রায় পাঁচ শত বছরের পুরাতন এই কালী মন্দির শুধু হিন্দুদের উপাসনার জায়গা হিসেবেই খ্যাত নয়। ঢাকা নগরীর পত্তনের ইতিহাসের সাথেও এই মন্দিরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যময় এই মন্দিরটি নির্মিত হলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হবে শুধুমাত্র এই যুক্তিতে এখানে মন্দির পুনঃনির্মাণের অনুমতি না দেয়ার পেছনে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। হিন্দু প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। সেদিন, সরকারি উদ্যোগে পুরাতন ঐতিহ্য বাঁচাবার এ মন্দির নির্মিত হলে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন না হয়ে আরো বেশি অর্থপূর্ণ হতো। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সৌন্দর্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই রমনার কালীবাড়ি পুনঃনির্বাণ করা যেত। এখনো যায়। কিন্তু এই দেশে তা কি আর সম্ভব?

আমি ইতোপূর্বে বলেছি, শরণার্থী শিবির থেকে প্রত্যাগত হিন্দু সম্প্রদায় দেশে এসেই আশাহত হয়েছিল। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষই পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে একথাও সত্য যে, এই নির্মম অত্যাচারে যে ১ কোটি মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত জনগোষ্ঠি। পাকবাহিনী তাদেরকে বিতাড়িত করেছে ঠিকই কিন্তু তাদের লুণ্ঠিত পালের গরু, ঘাটের নৌকা, ভিটার ঘর পাকবাহিনী সাথে করে নিয়ে যায়নি–সেগুলো আত্মসাৎ করেছে পাকবাহিনীর সহযোগী, দোসর, দেশীয় প্রতিবেশী রাজাকার, আলবদর, আলশামসরাই। তাই প্রত্যাগত শরণার্থীরা আশা করেছিল দেশে ফিরে এসব লুণ্ঠিত মালামাল তারা ফেরত পাবে; অন্তত তা পাওয়ার

www.pathagar.com

ব্যাপারে পাবে আওয়ামী লীগের সমর্থন ও সরকারের কাছ থেকে আইনগত সাহায্য। পরিতাপের বিষয় সে আশা তাদের পূরণ হয়নি। লুণ্ঠিত মালামাল প্রত্যার্পণের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কোন আইন করেনি, শেখ মুজিবুর রহমানের দরাজ গলায় কোন আহ্বান আসেনি সেগুলো ফেরত দেওয়ার, বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি সেগুলো ফেরত না দেয়ার পরিণামে কোন হুঁশিয়ারি বা শাস্তির নির্দেশ।

পক্ষান্তরে যে রাজাকার, আলবদর, আল শামস আর লুটেরারা তাদের ঘরবাড়ি, গরু-বাছুর লুণ্ঠন করলো, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শূন্য করে দিল তার চৌদ্দ পুরুষের ভিটেবাড়ি, যারা হত্যা করলো তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যাকে, ইজ্জত কেড়ে নিলো স্ত্রীর, বোনের, মায়ের, অবাক বিস্ময়ে আর সীমাহীন বেদনায় এ দেশের সংখ্যালঘুরা দেখলো পাকবাহিনীর দোসর সেই রাজাকাররা ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের এক ঘোষণায় মুক্তি পেয়ে গেল। ইতোপূর্বেকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি, জনসভার ক্রন্দন, মানব সমাজ ও ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকার ভীতি প্রকাশ করে দেয়া বক্তব্য ইত্যাদি বিস্মৃত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিলেন দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকল আটক রাজাকারকে সপ্তাহের মধ্য মুক্তি দিতে, যাতে তারা শরীক হতে পারে তৃতীয় বিজয় দিবসের উৎসবে।

এভাবেই মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী উন্মাদদের আবার স্বজন হারানো জনতার মাঝে ছেড়ে দেয়া হলো। স্বজনহারা ভিটেমাটি শূন্য এক কোটি মানুষের হৃদয়ে শেখ মুজিবের এই কীর্তি আজো নীরবে রক্ত ঝরায়, যুগ যুগ ধরে ঝরাবে।

অনেকে বলে থাকেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল সাধারণ ক্ষমার, লুণ্ঠিত মালামাল প্রত্যার্পণের আদেশ দিলে অথবা তা ফিরিয়ে আনার বিহিত ব্যবস্থা করলে নাকি সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা দিতো। সবিনয়ে তাদের কাছে নিবেদন করি, আমার ঘাটের নৌকা, পালের ঘরু, ঘরের চালা, আমার পুরুষানুক্রমিকভাবে ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল, খাট-পালংক, আমার প্রতিবেশীর ঘাটে, গোয়ালে আর ঘরে দেখে, আর প্রশাসনিক নীরবতার কারণে তা উদ্ধার করতে না পারার মর্মবেদনা নিরূপায় হয়ে নীরবে সহ্য করা যায় ঠিকই, কিন্তু ঐ প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির অতিমানবিক গুণাবলী আয়ত্ত করা যায় না। আর সেই সঙ্গে আস্থা স্থাপন করা যায় না, ঐ প্রশাসন ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপরও।

আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের এইসব কাজের দরুণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে যে ক্ষোভ ও হতাশা সঞ্চারিত হচ্ছিল তা আরো বৃদ্ধি পেল পাক-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে আয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি আইনের বিলুপ্তি না ঘটায়। এই নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক কালো আইনটি এ দেশের সংখ্যালঘুদের জীবনের এক মূর্তিমান বিভীষিকা। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই আইনের দ্বারা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে একতরফাভাবে।

সংখ্যালঘুদের আশা ও বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতার পর এই আইনটি অবশ্যই লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে আওয়ামী শাসনামলেই ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে আইনটি তার নামে পাল্টিয়ে একটি অধ্যাদেশ থেকে সংসদীয় আইনে পরিণত হয়ে তার ভিত্তিকে আরো পাকাপোক্ত করলো।

www.pathagar.com

কিন্তু এসবের পরেও সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থিতি সংখ্যালঘুদেরকে একেবারে হতাশ করেনি। কিন্তু এরপর শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যা সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার বোধের স্বীকৃতি ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দিল আর প্রশস্ত করলো বাংলাদেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরের পথকে।

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন। কয়েকটি মুসলিম দেশের বিশেষ তৎপরতায় সকলকে অবাক করে দিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর যোগদান করেন এই সম্মেলনে। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে ইসলামী রাষ্ট্র সংঘের। এ সদস্য পদ গ্রহণে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা কি ক্ষুণ্ন হয়নি? এটা কি রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়? একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে এই সদস্য পদটি সোনার পাথর বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই অবাস্তব ও হাস্যকর নয় কি? এসব প্রশ্ন কি সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানের মনে উদিত হয়নি?

এই সম্মেলনে শেখ মুজিব যে ভাষণ দেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করিতে হইবে। আমরা যদি মহানবীর প্রচারিত মানব প্রেম, মর্যাদা ও শ্বাশত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারি তাহা হইলে বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে। এইসব মূল্যবোধে উজ্জীবিত হইয়া শান্তি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারি।"

শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সম্পর্কে 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সংখ্যালঘু সংকট গ্রন্থের লেখক কংকর সিংহের বেদনাতুর মন্তব্য, এখানে আমরা যে শেখ মুজিবকে পাই তাকে চিনতে আমাদের একটু কষ্ট হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের জনক শেখ মুজিব এখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নতুন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার যে আহ্বান জানান সে সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ তিনি পাকিস্তানের দুই যুগের শাষণে না দেখেছেন তা নয়। ইসলামের নামে নতুন মুসলিম দেশগুলোতে স্বৈরতন্ত্রী শাসকেরা যেখানে জনগণের উপর জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছেন–ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে তাদের সাথেই সাক্ষাৎ হয়েছিল শেখ মুজিবের। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের যে বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল শেখ মুজিবুর রহমান তার পাশ দিয়েও যাননি।

কিন্তু বাংলাদেশকে কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভূক্ত করেই শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষান্ত হননি। এর ধারাবাহিকতার পথ ধরে ১৯৭৫ সালের ২৫শে মার্চ তিনি ইতোপূর্বে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী ফাউণ্ডেশনকেও পুর্ণজীবিত করলেন–কিন্তু সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো না হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ফাউণ্ডেশন-আজও হয়নি।

ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান এইভাবে ক্রমশঃ সরে যাওয়ায় বিস্মিত ব্যথিত কংকর সিংহ বলেন, "সংখ্যালঘুদের প্রতি মমত্ববোধ ধর্মনিরপেক্ষ

www.pathagar.com

থাকেনি। বঙ্গবন্ধু তার আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি উদার হতে পারেনি।"

বাঙালী জাতীয়তাবাদের জনক বলে কথিত শেখ মুজিব সম্পর্কে একইরূপ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নিবন্ধকার জনাব গোলাম মুরশিদ। তার ভাষায়, "পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই বাংলাদেশের প্রতি ধর্ম এবং ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে যে সংকেত দেখান তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কোনদিন ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। তার পরিচয় ইসলামী না হলেও সে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র।" (স্বরূপের সংকট-গোলাম মুরশিদ, ভোরের কাগজ ৬জুন ১৯৯৭) শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি এই দ্বিধাযুক্ত, অস্পষ্ট ও শিথিল দৃষ্টিভঙ্গির পথ ধরেই বাংলাদেশে যাত্রা শুরু হলো ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির, যার পরিণতিতে সংখ্যালঘুরা ধীরে ধীরে পরিণত হতে লাগলো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।

আমি পর্বেই বলেছি সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ এবং পরবর্তীকালে সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে সাংবিধানিকভাবেই, অথচ সেই বিলুপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতার নামেই এদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বিশেষ কোন রক্ষাকবচ বা সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা থেকে। এটাই সংখ্যালঘুদের প্রতি একধনের পরিহাসেরই নামান্তর।

সকল দেশের ধর্মীয়, ভাষাগত বা নৃতাত্বিক সংখ্যালঘুরা তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু সাংবিধানিক বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকে। কিন্তু আমাদের সংবিধান এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। আমাদের সংবিধানে বিশেষ কোন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধার বিধান না রেখে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" (২৭নং ধারা)

কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না। [২৮ (১) ধারা]

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২৯নং ধারা)

'কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য না করার সাথে সাথে বিপরীতক্রমে ধর্মীয় কোন গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোন সুযোগ না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে-তা সে ধর্মীয় জনগোষ্ঠী যতই অনগ্রসর অনুন্নত বা পশ্চাদপদ হোক না কেন?

আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের উন্নতির বিধান ও আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য ও কোন বিশেষ বিধি বিধানের ব্যবস্থা না রেখে কেবলমাত্র তাদের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র যাতে বিশেষ বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ২৯ নং ধারার ৩নং উপধারায় (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ

www.pathagar.com

করতে পারেন সেই উদ্দেশ্য তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।"

সংবিধানের এই একটিমাত্র ধারায় রাষ্ট্রের অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য এই সদিচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও সংবিধানে অনগ্রসর নাগরিকের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বস্তুত রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে কোন জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অনগ্রসরতার কোন ব্যাখ্যা না থাকায় এই ধারাটি একটি বহু অর্থজ্ঞাপক, প্রয়োগহীন ও অকার্যকর ধারায় পরিণত হয়েছে। এ কারণেই সংবিধান গৃহিত হওয়ার পর ২ যুগেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হলেও সংবিধানের এই ২৯নং ধারার ৩ (ক) উপধারার অনুসরণে অনুন্নত অনগ্রসর নাগরিকদের উন্নতির জন্য কোন আইন প্রণিত হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে তফসিলী সম্প্রদায়কে একটি অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ রক্ষা ও বিকাশের জন্য একাধিক বিশেষ বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছিল। সে সমস্ত বিধি-বিধান আমি ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের এই সংবিধানে এই সমস্ত বিধি-বিধানের সাথে তফসিলী সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তফসিলীদের একটি তালিকাও প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২০৪ নং ধারায় তফসিলীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল "The castes, races and tribe and their group within castes, reces tribes which immediately before the coustitation day constituate the schedulede caste within the meaning of the fifth schedulede to the Government of India Act 1936 shall for the purpose of the coustitutation be deemed to be schedulede caste until parliament by law or other wise provided,"

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায় তিনটি দশক। সিকি শতাব্দিরও এই অধিককালে এদেশের অনগ্রসর তফসিলী সম্প্রদায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে কেবল যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকেই বঞ্চিত হয়েছে তাই নয়-এই কাল পর্বে সরকারী চাকরি তথা প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থান প্রায় শূন্যের কোটায় পৌঁছেছে। কিন্তু কেবলমাত্র তফসিলী সম্প্রদায়ের কথাই যা বলি না কেন, এই ২৭ বৎসরে সমগ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা আজ শতকরা ৫ ভাগেরও নীচে। সচিব পর্যায়ে কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল না।

সম্প্রতি এলপিআর এ যাওয়া একজনকে সচিব করা হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এই হার শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকারি কোন কমিশন সংস্থার কোন প্রধান কিংবা রাষ্ট্রদূত পদে কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেই। পরিচালক মণ্ডলিতেও ছিল না, সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীতে ২ জন মাত্র সদস্য নেয়া হয়েছে।

কমিশন, সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী পর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হার প্রশাসনের মতই হতাশাব্যঞ্জক।

www.pathagar.com

সরকার প্রয়োজনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠী থেকে লিখিত মৌলিক ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্যে কর্মকর্তা নির্বাচিত করে নিয়োগ দান করে থাকে। কিন্তু দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের (তফসিলী বর্ণ হিন্দু নির্বিঃশেষে) শিক্ষিতের হার শতকরা চল্লিশোর্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই হারে নিয়োগ নেয়া হয় না। এমনকি মোট জনসংখ্যার হারে হিন্দুদের নিয়োগ দেয়ার কোন নজির নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কোন হিন্দুকে নিয়োগ করা হয়নি। যাদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের সমযোগ্যতা সম্পন্ন, অনেক ক্ষেত্রে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন বা বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আছেন এমনকি 'ভাইবা' বোর্ডের মেম্বার করার সময়ও খুব সচেতনভাবে হিন্দু অধ্যাপকদের বাদ রাখার প্রবণতা রয়েছে। সহযোগী অধ্যাপককে 'ভাইবা' বোর্ডের মেম্বার নেওয়া হয় কিন্তু হিন্দু অধ্যাপককে ভাইবা বোর্ডে নেয়া হয় না। এরকম উদারহরণ রয়েছে প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার এই তিনটি পদে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দান করে থাকেন। স্বাধীনতার পর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই তিনটি পদে শতাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু এই শতাধিক ব্যক্তির একজনও হিন্দু ছিল না। বলাবাহুল্য যাদেরকে এই তিনটি পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সমযোগ্যতা বা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক হিন্দু, দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন, ছিলেন। এমনটি ভিসি, প্যানেলেও কোন হিন্দু অধ্যাপকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও নজির নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, মেম্বার করার নজির নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন হিন্দুও নেই। দেশের কোন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে স্বাধীনতার পর একজন হিন্দুকেও নিয়োগ করা হয় নাই।

সরকারি চাকরি প্রশাসন তথা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের অনগ্রসর তফসিলী সম্প্রদায় তথা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্বহীনতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে হতাশা, বিক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতা বোধ যা জাতীয় ঐক্য চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। কারণ ভাষা জাতি গঠনের একটি মশলা হতে পারে কিন্তু একমাত্র মশলা কখনোই নয়। সমাজের স্তরে স্তরে সুযোগ সুবিধা আর স্বচ্ছন্দের তারতম্যের মধ্যেই বিভেদের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে ক্রমে ক্রমে তা ফুটেও উঠে। দেশের এত বিপুল সংখ্যার সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে কোন রাষ্ট্রেই তাদের অনুগত্য পেতে পারে না, আর আনুগতাহীন নাগরিক যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সমস্যার কারণ।

এ সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ সংখ্যালঘুদের মন-মানসিক থেকে এই হতাশাজনিত বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করার জন্য প্রয়োজন সরকারি চাকরিসহ জাতীয় জীবনের সকল স্তরে তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দানের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। এ জন্য সংবিধানের ২৯নং ধারায় ৩নং উপধারার (ক) অনুচ্ছেদের কার্যকর প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তার সঠিক তালিকা প্রণয়ন। অন্যথায় সংবিধানের এই ধারা একান্তভাবেই অকার্যকর ও অর্থহীন হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

অতঃপর আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমি এ নিবন্ধের ইতি টানবো। এই ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা লোপই ঘটানো হয়নি, সংবিধানের শীর্ষে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং একই সাথে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস,-গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। "অতঃপর রাষ্ট্রের ইসলামী আদর্শকে আরো সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে" রাষ্ট্র পরিচালনায় মুলনীতি অধ্যায়ের ৮নং ধারার ১ (ক) উপধারায় স্পষ্ট করে বলা হলো "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলেও রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান সাংবিধানিকভাবেই করা হয়েছিল। কিন্তু ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হলেও সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার কোন বিশেষ বিধান সন্নিবেশিত না করে বলা হয়েছে–"রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে"। শান্তিতে ধর্ম পালন করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করা এক কথা নয়। সংখ্যাগুরুর ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও ভোগের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ বা বিশেষ বিধিবিধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি বলা হয়েছিল–"HEREIN adequate provision should be made for the minorities freely to posses and practice for their religion and develop their culture".

সংবিধানের শীর্ষে সন্নিবেশিত বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম এবং ২য় অধ্যায়ের আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি শব্দগুচ্ছ অবশ্যই এদেশের অধিকাংশ তথা শতকরা ৮৮ ভাগ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ ও চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাকী ১২ শতাংশ জনগোষ্ঠির ধর্মীয় অনুভূতির সাথে এই শব্দগুলোর কোন সম্পৃক্তি আছে কি? একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস কি একজন হিন্দুর ঈশ্বর বিশ্বাসের সমার্থক? বস্তুত স্রষ্টার উপর বিশ্বাসের ধরণ সবার এক নয়, এ বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত, ধর্মগত এবং গোত্রগত। কখনোও বা আবার শ্রেণীগতও। কাজেই যাদের বিশ্বাস ইসলামী বিশ্বাসের সম্পূরক বা সমার্থক নয় বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের মর্যাদা অবশ্যই ভিন্নতর। তারা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাথে সমমর্যাদা পেতে পারে না।

সাংবিধানিকভাবে না হলেও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণার ফলে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম-নাগরিকত্বের মর্যাদা হারিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্যতাও হারিয়েছে-কারণ রাষ্ট্রধর্ম

www.pathagar.com

যে ক্ষেত্রে ইসলাম সে ক্ষেত্রে ইসলাম বহির্ভূত কোন ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র প্রধান হওয়া সম্ভবত অসাংবিধানিক।

সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী এ দেশের সংখ্যালঘুদের আজ এক অবমাননা ও অমর্যাদাকর অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। সংবিধানের মৌল চরিত্রের পরিবর্তনকারী এ দু'টি সংশোধনী বাতিলের দাবি তাই সর্বস্তরের সংখ্যালঘুর প্রাণের দাবি।

এখানে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীই নয়- স্বৈরাচারী এরশাদ যখন ৮ম সংশোধনী জারি করেন তখন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং আজকের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই এই সংশোধনীর বিশেষ প্রতিবাদ করেছিলেন তীব্র ভাষায়।

আওয়ামী লীগ নেত্রী মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা বলেছিলেন-"রাষ্ট্রধর্ম বিল সর্বস্তরের জনগণ প্রত্যাখান করিয়াছে; স্বৈরাচারের ক্ষমতার মসনদকে রক্ষার কুট-কৌশল হিসেবে পবিত্র ধর্মকে ব্যবহারের চক্রান্ত চলিয়াছে।"

অন্যদিকে বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন-"রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ধর্মের নামে জাতিকে বিভক্ত করিয়া অনৈক্য সৃষ্টিও জনগণকে ধোকা দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৮/৬/৮৮)"

পরিতাপের বিষয় হলো দুই নেত্রীই পর্যায়ক্রমে ক্ষমতাসীন হয়েছেন কিন্তু কেউই এই সংশোধনীর পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ তো দূরের কথা এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্যও করেননি। তবে কি এসব বিবৃতির সাথে তাদের অন্তরের কোন যোগ ছিল না? তবে কি এসব বিবৃতি ছিল কেবল এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সান্ত্বনা দেয়া মাত্র। এ সম্পর্কে কংকর সিংহের মন্তব্য উদ্ধৃত করেই আমি আমার এ নিবন্ধের শেষ করবো।

"এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়া হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী। তারা যৌথভাবে সংবিধান সংশোধন করে দেশে রাষ্ট্রপতি শাশিত সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সরকারে প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করেননি। বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন শেখ হাসিনা, তিনিও নীরব সংবিধানের এই ৮ম সংশোধনীর ক্ষেত্রে। কিন্তু কেন?'

কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর?

www.pathagar.com

কালিদাস বড়ালের হত্যা
সংখ্যালঘুদের জন্য অশনি সংকেত

বাংলাদেশের প্রবীণ এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেন একদা স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তার সে আবেদনের মধ্য দিয়ে সেদিন বাংলাদেশের আপামর জনতার আর্তিই প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর অনেকদিন গত হয়ে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে। কিন্তু দেশের মানুষের সেই আর্তি সেই স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয় তার আবেদন আজও পূরণ হয়নি। পক্ষান্তরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর আতংক আজ দেশের সকল স্তরের মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হত্যা যেন আজ দেশের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পীর মাশায়েক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সরকারি কর্মচারী, ছাত্র, যুবক সকলেরই নির্ধারিত নিয়তি। জাতীয় পত্রিকাসমূহে হত্যার পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বিগত নয় মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছেন ১২ জন আর ধর্ষিতা হয়েছেন ১১জন। ২রা অক্টোবর দিনকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত ৯ মাসে বাংলাদেশে নিহত হয়েছেন ২৬০৯ জন আদম সন্তান। অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১০ জন মানুষ ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুই যেন আজ স্বাভাবিক।

গত কয়েকদিন আগে জনগণের মুখোমুখি নামক বিটিভি'র এক পাতানো অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনসাধারণের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায়। উক্ত অনুষ্ঠানের অনেকেই তাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন, বাকপটু প্রধানমন্ত্রী সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে অসাধারণ বাক চাতুর্যের পরিচয়ও দিয়েছেন তার স্বভাব সুলভ ভংগিতে নিজের দায় অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে। অনুষ্ঠানটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কেউ যদি তাকে প্রশ্ন করেন, দেশে এত হত্যা হচ্ছে কেন, এত রক্ত ঝরছে কেন? কি উত্তর দেবেন প্রধানমন্ত্রী? না, কেউ প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি এ প্রশ্ন করেননি বা তেমন প্রশ্ন আসার সুযোগ দেয়া হয়নি। কিন্তু কেউ যদি করতেন জানি না কি উত্তর দিতেন উনি। তবে অনুমান করতে পারি। উনি হয়তো বলতেন জনসংখ্যা সমস্যা যে দেশের প্রধানতম সমস্যা সে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে হত্যা একটি উত্তম পন্থা! যেমন বলেছেন হরতাল হলে পরিবেশ দুষণের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যায়, নিরাপদে পথ চলা যায়, রিকশাওয়ালাদের দু'টাকা বেশি রোজগার হয় ইত্যাদি। অথবা হয়তো বলতেন শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার না হওয়াই এসব হত্যার কারণ এবং মুজিব হত্যার বিচার যতদিন সম্পন্ন না হবে ততদিন হত্যা চলতেই থাকবে।

কিন্তু হত্যার কারণ যাই হোক না কেন দেশব্যাপী হত্যার মহোৎসব চলছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহতভাবেই চলছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাসী যেই হোক, রেহাই দেওয়া হবে না এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সন্ত্রাসীকে মাটির নিচ থেকেও তুলে আনা হবে ইত্যাদি হুমকি ধামকিকে ব্যর্থ করে দিয়ে হত্যা আজ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

এই প্রক্রিয়ায় সম্প্রতি নিহত হয়েছেন ঢাকার এডভোকেট জনাব হাবিবুর রহমান মণ্ডল, বাগেরহাটের এডভোকেট কালিদাস বড়াল, খুলনার এসএমএ রব, যশোরের সংবাদিক শামছুর রহমান এবং সম্ভবত নোয়াখালীর অপহৃত বিএনপি নেতা এডভোকেট নুরল ইসলাম।

প্রতিটি মৃত্যুই মৃতের-পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক আর সে মৃত্যু যদি হয় অসময়োচিত ও অস্বাভাবিক তবে সে মৃত্যুর বেদনা হয় সীমাহীন তার সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।

স্বজন হারানোর বেদনায় ব্যথিত হন সকলেই কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু আছে যার বেদনা তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হয় একটা গোটা অঞ্চল ও সমাজে, কোন কোন ক্ষেত্রে সারাদেশেও।

এমনি একটি মৃত্যুরই শিকার হয়েছেন বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার দুই দুইবারের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট কালিদাস বড়াল। তার হত্যায় কেবল বাগেরহাট জেলারই নয়, গোটা দক্ষিণ অঞ্চলের সকল স্তরের জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি যেমন হয়েছেন শোকাভিভূত তেমনি হয়েছেন আতংকিত।

এডভোকেট কালিদাস বড়াল খুব বড় মাপের জাতীয় নেতা ছিলেন না ঠিকই, তবে বাগেরহাট খুলনা, গোপালগঞ্জ এবং যশোর-বরিশালের সংখ্যালঘুদের তিনি ছিলেন একান্ত আস্থাভাজন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তার এলাকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত প্রতিনিধি বা মুখপাত্র।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল দেশেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী-তা যে ধর্ম, ভাষা, নৃতত্ত্ব, গাত্রবর্ণ ইত্যাদি-এর যে কোনটি ভিত্তিক হোকনা কেন, কিছুটা নির্যাতন অবহেলা এবং বৈষম্যের শিকার হয়েই থাকে-আর এরই ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় হতাশা ও হীনম্মন্যতা বোধের; যার পরিণতিতে প্রায়শই সংখ্যালঘু নেতৃত্ব হয় দুর্বল ও খোশামুদে। আর একথাও সত্য যে, দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও খোশামুদে চরিত্রের সংখ্যালঘু নেতৃত্বেই সংখ্যা গুরুর কাছে হয় গ্রহণীয় ও আদরণীয় এবং কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ। নিহত কালিদাস বড়াল সঠিকভাবেই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর এই ব্যতিক্রম ধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি তার স্বদলীয় ঈর্ষাকাতর প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এটাই তার পরিবারবর্গ ও এলাকাবাসীর ধারণা।

নিহত কালীদাস বড়ালের স্ত্রী শ্রীমতি হ্যাপী বড়াল গত ৫ সেপ্টেম্বর তার বাগেরহাট শহরের বাসভবনে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপ কালে অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। শ্রীমতি বড়াল বলেন, "ও যদি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা প্রকাশ না করতো, নির্যাতিত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে অস্ত্রধারী ক্যাডারদের সাথে থেকে লুটপাটে অংশ নিত তবে ওকে খুন হতে হতো না। ওর সে কিলার ও গডফাদারদের রাজনৈতিক পরিচিতি থেকেই স্পষ্ট হয়েছে ওকে কারা হত্যা করেছে।"

www.pathagar.com

একটু আগেই বলেছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হীনম্মন্যতা বোধে আচ্ছন্ন এবং দুর্বল ও খোসামুদে হয়ে থাকে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিনৈতিক অবস্থানের কারণেই এমনটা হয়। বস্তুত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করে ও মেনে নেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সংখ্যালঘুর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় এবং অনুগত ও অনুসারির ভূমিকা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে। বাবা সাহেব ডঃ বি, আর, আম্বেদকরের ভাষায় 'সংখ্যালঘু নেতৃত্ব যতক্ষণ তাদের দাবি দাওয়া ও নেতৃত্বকে ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সংখ্যাগুরুর নেতৃত্বের বিরোধ সৃষ্টি হয় না। বিরোধ সৃষ্টি হয় তখনই যখন সংখ্যালঘু নেতৃত্ব রাজনৈতিক অধিকার ও নেতৃত্বের দাবিদার হয়। সংখ্যালঘু নেতৃত্ব ততক্ষণই সহনীয় যতক্ষণ তারা "ফলোয়ার', তখনই তারা শত্রু যখন তারা হতে চায় 'লীডার'।

১৯৯৬ সালের প্রায় ৬০ শতাংশেরও অধিক সংখ্যালঘু এলাকা খুলনা জেলার দাকোপ বটিয়াঘাটা থেকে শেখ হসিনার ছেড়ে দেয়া আসনে উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে পঞ্চানন বিশ্বাস হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত। আর ২০০০ সালে শেখ হাসিনার আর এক নির্বাচনী এলাকা চিতলমারী-বাগেরহাট আসনে নির্বাচন করার আশা প্রকাশ করে এডভোকেট কালীদাস বড়াল হলেন নিহত। দক্ষিণ বংগের দু'টি হিন্দু প্রধান নির্বাচনী এলাকার উদ্ভুত ঘটনা দু'টি যেমন ডঃ আম্বেদকরের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করছে তেমনি অত্র দু'টি এলাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দুদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগে তাদের নেতৃত্ব কতদূর পর্যন্ত সহনীয় এবং কতদুর পর্যন্ত তা প্রসারিত হতে পারে। তাই বলছিলাম এডভোকেট কালীদাস বড়ালের হত্যা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে কেবল ব্যথিত, বেদনাতুরই করেনি-এ হত্যা তাদের আতংকিতও করে তুলেছে। কালিদাস বড়ালের হত্যা কেবল একটি ব্যক্তি হত্যা নয়, একটি প্রতিকী হত্যা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি এক অশনি সংকেত। প্রায় ২ মাস হতে চললো কালিদাস বড়াল নিহত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার পরিবারবর্গসহ এলাকাবাসীর মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছে পিতৃহারা অদিতি বড়াল। অদিতির প্রশ্ন বাবা খুন হওয়ার এত দিন পরও ঘাতক জুয়েল, স্বপন, তুষার ও অন্যতম গডফাদার আওয়ামী লীগ নেতা চান মিয়া মোল্লা, চিতলমারী থানা যুবলীগের সভাপতি শিকদার আলমগীর সিদ্দিকী ও বাগেরহাট থানা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি বাবলু মোল্লাসহ জড়িতদের পুলিশ কেন ধরতে পারছে না? এদের ধরতে না পারার কোন রহস্য আছে কি না? যুবলীগ থেকে আলমগীরকে বহিস্কার করা হলো। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ থেকে চান মিয়া মোল্লা ও বাবলু মোল্লাকে এখানো কেন বহিস্কার করা হয়নি? বাবার হত্যাকারী সাঈদ ও বাবলু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর ১২ দিন অতিবাহিত হলেও মামলার নথিতে তা এখনও সংযুক্ত না হওয়ার রহস্য কি? এ দু'টি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে কাদের নাম আছে? আমাদের বাবা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের জেলা সভাপতি ছিলেন, তাই তারা বাবার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লাগাতার কর্মসূচি গ্রহণ করে চিতলমারী ও বাগের হাটে কালো পতাকা উত্তোলন করে। এখন ছাত্রলীগ নামধারীরা

www.pathagar.com

জোর করে কালো পতাকা নামাবার কেন চেষ্টা করছে? কেনই বা আমাদের দাদা অমিতাভ বড়ালকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে? এক দাদা অপূর্ভ বড়ালকে পিটিয়েছে?' নিহত কালিদাস বড়ালের স্ত্রী হ্যাপী বড়াল বলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার। বাবুকে দলের লোকেরা হত্যা করেছে, এটাই বাস্তবতা।" স্পর্শকতার এই মামলাটির পরিণতি সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে হ্যাপী বড়াল বলে, 'সব ঘাতক ও গডফাদারদের গ্রেফতার দেখতে চাই, বিচার চাই'।

নিহত কালিদাস বড়ালের কন্যা অদিতি বড়াল যেসব প্রশ্ন তুলেছে এবং তার স্ত্রী যে দাবি জানিয়েছে সেসব প্রশ্ন ও দাবি কেবলমাত্র চিতলমারী-বাগেরহাট এলাকার সর্বস্তরের জনগণের নয়-এ দাবি সারাদেশের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও।

এ লেখার শুরুতেই বলেছি কালিদাস বড়াল খুব বড় মাপের জাতীয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু দুই দুই বার নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান কালিদাস বড়ালের একটা জেলার নেতা হওয়ার মত যোগ্যতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাও তিনি হতে পারেননি-সে মর্যাদাটুকুও তাকে দেয়া হয়নি। নিহত বড়ালের কন্যা অদিতি বলেছেন 'একজন প্রতিমন্ত্রীর কারণে আওয়ামী লীগের সকল কমিটি থেকে বাবা বাদ পড়েছিলেন।'

পিতৃহারা অদিতি বড়ালের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের সেই নগ্ন রূপটি বেরিয়ে এসেছে, যে আওয়ামী লীগ হিন্দুদের কাছ থেকে অব্যহতভাবে পেতে চায় কেবল নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত সমর্থন, প্রশ্নহীন আনুগত্য ও অনুগামীতা। এ কারণেই বহু বিস্তৃত আওয়ামী লীগের মন্ত্রী সভায় কোন হিন্দু লাভ করতে পারে না ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা, এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ন্যায্য দাবি দাওয়া জানাতে গিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু নাগরিকরা এক পা ভারতে এক পা বাংলাদেশে রাখা অর্ধ বাঙালী অর্ধ ভারতীয় বলে হন তিরস্কৃত। এদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের আওয়ামী লীগের কাছে দেনা আছে, পাওনা আছে, দায়িত্ব আছে শরিকানা নাই। পরিশেষে একটি ছোট ঘটনা বলেই এ নিবন্ধের শেষ করবো। "বিধবা মায়ের ছেলে ট্যানা রাতে হাট থেকে বাড়ি আসছে অনেক রাত করে। উদ্বিগ্ন মা জিজ্ঞেস করলেন বাবা, হাট থেকে কিভাবে আসলি? ট্যানার উত্তর 'কেন শেখ সাবদের নৌকায় এলাম। 'ট্যানার পায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কাদা দেখে মা জানতে চাইলেন নৌকায় আসলি, তাহলে পায়ে এত কাদা কেন? ট্যানা বললো নৌকায় আসছি ঠিকই তবে সারাপথই নৌকার গুণ টেনেছি, নৌকায় উঠতে পারি নাই। শানেনজুল এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগ্য ওই ট্যানার মতই, আওয়ামী লীগের নৌকা গুণ টেনে মর্নাজলে মকসুদের পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব থাকলেও ঐ নৌকায় ওঠার অধিকার, ক্ষমতা, যোগ্যতা, তাদের নেই।

www.pathagar.com

বিশেষ সাক্ষাতকারে তফসিলি নেতা কার্তিক-গণেশ আ'লীগ ছাড়া অন্য দলগুলো হিন্দুদের ভোট নিতে জানে না

সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দল, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সংগঠনের সহিত দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় জীবনের এই জটিল ও কঠিন অবস্থা দ্রুত উত্তরণের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী তফসিলি সেলের আহবায়ক কার্তিক ঠাকুর এবং যুগ্ম আহবায়ক গণেশ হালদার সুগন্ধা প্রতিনিধির কাছে দেয়া এক সাক্ষতকারে তাদের উপলব্ধির কথা তুলে ধরেছেন।

সুগন্ধা ঃ সংখ্যালঘু বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

কার্তিক-গণেশ ঃ সংখ্যালঘু হচ্ছে রাষ্ট্রের এমন এক জনগোষ্ঠী যারা নিজেদেরকে পৃথক এক জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করে বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কর্তৃক অবহেলা, অস্বীকৃতি ও বঞ্চনার কারণে স্বতন্ত্র এক জনগোষ্ঠী হিসেবে ভাবতে বাধ্য হয়। এ আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। সার্বিক অর্থে তারা একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বা গ্রুপে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু-জাতীয় সংসদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব এখানে জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার কত কম এবং সে সংখ্যাও প্রতিনিয়ত হ্রাসমান। যেমন ১৯৫৪ সালের ৩০৯ আসনবিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যালঘু সদস্য ছিলেন ৭২ জন, তন্মধ্যে তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য ৩৭ জন। এরপর ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা হয় ৮ জন, ১৯৭৩ সালে ১২ জন, তন্মধ্যে ২ জন বৌদ্ধ, ১৯৭৯ সালে আবার তা নেমে এসে দাঁড়ায় হিন্দু-বৌদ্ধ মিলে ৮ জন, ১৯৯১ তে ১২ জন। ১৯৯৬ তে এই সংখ্যা সব মিলে দাড়িয়েছে মাত্র ১৪ জনে। অথচ লোক সংখ্যা অনুপাতে এই সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল কম করে হলেও ৩০ জন। স্বাধীনতার পর কেবলমাত্র ১৯৭৩ সালের মন্ত্রীসভাতেই ৩ জন সংখ্যালঘু মন্ত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ১ জন মাত্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। এরপর আর কোন তপসিলি সদস্য কে মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়নি এবং হিন্দুদের সংখ্যাও দু'য়ের অধিক হয়নি। বর্তমান মন্ত্রিসভায় দু'জন মন্ত্রী থাকলেও তারা তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত নন এবং তারা মন্ত্রী তথা পূর্ণমন্ত্রীও নন-প্রতিমন্ত্রী মাত্র। একটি দেশের একদশমাংশের অধিক জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদে এই প্রতিনিধিত্বহীনতা এ দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, সাংবাদিক কেউ লক্ষ্য করছেন না এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্যও রাখছেন না, এটা একাধারে বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক। জাতীয় জীবনের

www.pathagar.com

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর এই প্রতিনিধিত্বহীনতা যে তাদের মনে ক্ষোভ, বেদনা ও হতাশা সৃষ্টি করে তাদেরকে মূল স্রোতধারা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে-এটা হচ্ছে সংখ্যালঘু মানসিকতা।

সুগন্ধা ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে সংখ্যালঘু বলে কোন কথা নেই। আপনারা কেন সংখ্যালঘু বলছেন?

কার্তিক-গনেশ ঃ ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা সংবিধানের চার স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সে কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে কোন জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়নি এবং ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রশ্ন উঠেনি। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সেদিন ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুত্বের প্রশ্নটির সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে যেখানে সুস্পষ্ট এবং অত্যধিক পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয় তাঁরা সেদিন সেটা অনুভব করেননি। পরে ১৯৭৯ সালে সংবিধান হতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ এবং ১৯৮৮ সালে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংবিধানের মৌল পরিবর্তন ঘটানোর পর এদেশে ইসলাম ধর্মের বাইরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী যথা ঃ হিন্দু, খ্রিষ্টান বৌদ্ধ সম্প্রদায় সাংবিধানিকভাবেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

সুগন্ধা ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি মাঝে মাঝে আপনারা তপসিলি সম্প্রদায় বলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করছেন। কেন-এটা করছেন?

কার্তিক গনেশ ঃ আপনি যে কথাটি বলছেন সে প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হলোঃ তপসিলিভুক্ত জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই একটি অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী। তপসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে-জেলে, মালো, নমঃশুদ্র, রাজবংশী, মুচি, মেথর, ডোম, বাগধী, ঋষি, সাঁওতাল, মাইতি, কুমী, পৌণ্ড্র, নাথ প্রর্ভতি ৭৮টি পেশাজীবি সম্প্রদায়-যাদের অধিকাংশই হচ্ছে একান্ত কায়িক শ্রমনির্ভর।

সবদেশের সংবিধানেই সে দেশের অনুন্নত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিকাশ কৃষ্টি-কালচারের উন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের সকল স্তরে প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিশেষ বিধি-বিধানও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং উপধারায় (ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র যাতে অনুন্নত অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে তার বিধান রাখা হয়েছে। পরিতাপের বিষয় হলো অনুন্নত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বলতে আমাদের দেশের নাগরিকদের কোন্ অংশটিকে বোঝাবে তার কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এমনকি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কোন তালিকাও প্রণয়ন করা হয়নি। এ কারণেই সংবিধান গৃহীত হবার পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত হলেও এই ২৯ নং অনুচ্ছেদের আলোকে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদের আলোকে অনতিবিলম্বে একটি কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হোক এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি

www.pathagar.com

বিধানের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ আইন-প্রণয়ন করে জাতীয় জীবনের মূল ধারার সহিত তাদের একীভূত করার পথ প্রশস্ত করুক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ যাতে অগ্রসর অংশের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে তারই প্রচেষ্টা করছি। এটাকে বিভেদ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত না করে বরং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করাই সমীচিন বলে আমরা মনে করি।

সুগন্ধা ঃ শুধু তপসিলি সম্প্রদায়ই যে অনুন্নত ও অনগ্রসর একথা আপনারা বলছেন কেন?

কার্তিক-গনেশ ঃ দেখুন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু জনগোষ্ঠীকে তপসিলি হিসেবে চিহ্নিত বা আখ্যায়িত করার একটি ইতিহাস আছে। সেটা হলোঃ তৎকালীন বৃটিশ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের এক তালিকা প্রণয়ন করে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পঞ্চম তপসিলে এ তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সিডিউল কাষ্ট বা তপসিলি সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করা হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারতের সংবিধান এবং ১৯৫৫ সালের পাকিস্তানের ২০৫ থেকে ২০৮ সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহে দেখা যায়-১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের তপসিলি সম্প্রদায়সমূহ অনগ্রসর হিসেবে সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত ছিল। এর এমন কোন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তফসিলিদের জাতীয় জীবনে ঘটেনি যার জন্য তাদেরকে নাগরিকদের অগ্রসর অংশের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়। ফলতঃ তপসিলীভুক্ত সম্প্রদায় যথা নমঃশুদ্র, বাগদী, সাওতাল, মূচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়কে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা তাদের প্রতি কেবলমাত্র অন্যায় নয় পরিহাসও বটে।

সুগন্ধা ঃ সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে কেন একচেটিয়া ভোট দেয়?

কার্তিক-গনেশ ঃ এদেশের সংখ্যালঘুদের একতরফাভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার পিছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রধান কারণ হচ্ছে-১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের হিন্দু বিশেষ করে বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় মেনে নেয় নাই। পাকিস্তানকে যখন কোনভাবেই ঠেকানো গেলো না তখন বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলাকে হিন্দু প্রধান ভারতের সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব সমর্থন করেছে। এ কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর বর্ণ-হিন্দুদের অধিকাংশই দেশত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু দেশভাগের সাথে সাথে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এদের কিছু অংশ এখানে থেকে যেতে বাধ্য হয়। এই থেকে যাওয়া বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায় কোনভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। সে সুযোগও ছিল না। কারণ কোন হিন্দুর পক্ষেই মুসলিম লীগের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এ সংগঠনটি ছিল তাদের আজন্ম শত্রু বা জানি দুশমন। এই পেক্ষাপটে পাকিস্তান সৃষ্টির দুই বছরের মধ্যে যখন মুসলিম লীগের একটা বিক্ষুব্ধ অংশ এবং মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশ আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম দিল, তখন বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায় তাদের চিরশত্রু মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত এই রাজনৈতিক দলটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো। এর

www.pathagar.com

অনতিকালপরে দলটি মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অন্তত কাগজে কলমে অসাম্প্রদায়িকতার রূপ নিলো এবং অমুসলমানদের এ দলের সদস্য হওয়ার পথ প্রশস্ত করলো। নিজেদের কোন শক্তিশালী সংগঠন তথা রাজনৈতিক দল না থাকায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন বর্ণ-হিন্দু নেতৃত্ব এ দলের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিলো। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির নির্দেশে এদেশে ফিরে আসে এবং সদ্য গঠিত আপাতদৃষ্টে অসাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দলটির সদস্য হয়ে যায়। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে কংগ্রেসী নেতৃত্বের উপর আস্থাশীল বাংলার বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তানের বিরোধিতা করলেও পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ তপসিলী সম্প্রদায় কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। তাদের রাজনৈতিক সংগঠন তপসিলী ফেডারেশন এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা পালন করে। তপসিলী ফেডারেশনের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে মুসলিম মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রীর দায়িত্বও গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর শ্রী মণ্ডল মুসলিম লীগের উপর আস্থা হারান এবং এক পর্যায়ে পাকিস্তান ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন। তার সহগামী হিসেবে অন্যান্য তপসিলী নেতৃত্বের দেশত্যাগের ফলে কার্যত তপসিলী ফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটে। এ কারণে তপসিলী সম্প্রদায়ও প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নিজেদের সংগঠন হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এর একটা কারণ হলো নিজেদের কোন রাজনৈতিক সংগঠন না থাকায় আওয়ামী লীগে যোগদানকারী বর্ণ-হিন্দুদেরকে কেবলমাত্র তাদের হিন্দু নামটির কারণেই নিজেদের প্রতিনিধি বা প্রতিভূ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, পাকিস্তান আন্দোলনে তপসিলীদের ভূমিকার অস্বীকৃতি এবং বর্ণ-হিন্দু তপসিলী নির্বিশেষে সকল সংখ্যালঘুর উপর একই রকম বৈষম্যমূলক আচরণ ও উপর্যপুরি দাঙ্গা বর্ণ-হিন্দু তপসিলীদের পারস্পরিক সম্পৃক্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

মুসলিম লীগ ছিল কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু তাদের কংগ্রেস বিরোধিতা ১৯৪৭ সালের পর রূপান্তরিত হয় ভারত বিরোধীতায় এবং এক পর্যায়ে তা রূপ নেয় হিন্দু বিরোধিতায়ও লক্ষ্য করার বিষয় হলো মুসলিম লীগ যে কারণে অকারণে ভারত বিরোধী বক্তৃতা বিবৃতিকেই তাদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করতে থাকে। আওয়ামী লীগ সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভারত বিরোধী বক্তৃতা বিবৃতিদানে বিরত থাকে। আওয়ামী লীগের এই ভূমিকা সংখ্যালঘু হিন্দুদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়া এখনও সচল।

এরপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ হিন্দু মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে একীভূত করে দেয় এবং সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাথে হিন্দুদের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।

১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ এই প্রায় দেড় যুগব্যাপী কালপর্বে পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন এবং তার ফলে তাদের উপর নেমে আসা নিপীড়ন ও নির্যাতনের সাথে সাথে আয়ুবীয় স্বৈরশাসনে হিন্দুদের উপর একের

www.pathagar.com

পর এক নির্যাতনমূলক আইন প্রয়োগ ও সামাজিক প্রশানসিক নিপীড়ন আওয়ামী লীগের সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাখী বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে। অতপর '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ হয়ে পড়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক ও পরিপোষক। নৌকা পরিণত হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রণীত হয় বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হিন্দুদের মনমানসিকতায় ধর্মনিরপেক্ষতা এক ধরনের স্বাপ্নিক আবেশ সৃষ্টি করেছিল। তারা মনে করতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের সকল নির্যাতন ও নিপিড়ন ও বৈষম থেকে মুক্তির পথ। আওয়ামী লীগ সে আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় এ সংগঠনটিকেই তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারক হিসেবে আরো গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলো। আওয়ামী লীগ কার্যত আর যাই করুক না কেন তারাই যে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংযুক্ত করেছিল, তারা যে এটাকে তুলে দেয় নাই এটাই এদেশের হিন্দুদের কাছে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বড় কথা। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্ট অধিবেশনের শুরুতে গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক পাঠ না করলেও অন্তত হিন্দু এলাকার জনসভায় গীতা পাঠ করায়, এটাও হিন্দুদের কাছে কম কথা নয়। যমুনা সেতুর উদ্বোধনের মত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গীতা পাঠ হয় না। কিন্তু গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনার আওয়ামী জনসভায় হয়, এটাই হিন্দুদের কাছে অনেক। বিষয়টির অন্য একটি দিকও আছে। সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আমার মতে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো এদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে একান্তভাবেই নিস্পৃহ। তারা ধরেই নিয়েছে আওয়ামী লীগ আর হিন্দু এক এবং অভিন্ন। আওয়ামী লীগের প্রতি হিন্দুর সমর্থন যেন চিরস্থায়ী। এটার আর কোন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন হবে না। তাই এ ব্যাপারে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ থেকে হিন্দুদের সরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের কোন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ নাই। তাই তারা আওয়ামী লীগের আর যে সমালোচনা করুক না কেন আওয়ামী লীগ তার অতীতের সাড়ে তিন বছরে এবং গত সাড়ে চার বছরে যে সমস্ত হিন্দু স্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে বিরোধী দলগুলো তাদের বক্তৃতা নিবৃতিতে কখনও তার উল্লেখ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আওয়ামী লীগই যে ১৯৭৪ সালে শত্রু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্সটিকে সংসদীয় আইনে পরিণত করে একে পাকাপোক্ত করেছে, আওয়ামী লীগই যে রমনা কালী বাড়ির জায়গা সরকারী সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছে একথা আওয়ামী লীগ বিরোধী কোন সংগঠন কোথাও বলেছে বলে আমাদের মনে পড়ছে না। পক্ষান্তরে তারা উল্টোই বলে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেয়ে হিন্দুদের তোষণ করছে, হিন্দুয়ানীকে জাতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে এটা আওয়ামী লীগের প্রতি হিন্দু সমর্থনকে আরো দৃঢ় করে। সুতরাং আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন দলকে ভোট দেয় না, এর চাইতে অধিকতর সত্য হলো অন্য কোন দল হিন্দুদের ভোট নেন না বা নিতে চায় না।

সুগন্ধা ঃ সংখ্যালঘু সমস্যা বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

www.pathagar.com

কার্তিক-গনেশ ঃ সংখ্যালঘু সমস্যা বলতে মূলতঃ বোঝায় "প্রতিনিধিত্বের সমস্যা"। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়-সব দেশে যেখানেই সংখ্যালঘু আছে সেখানেই এ সমস্যা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি-যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়াই সংখ্যালঘু সমস্যা।

বস্তুত রাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন বিশেষ অংশ যখন তার ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কারণে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মনে যে স্বাতন্ত্রবোধ বা বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয় তখন তারা নিজেদেরকে এক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে ভাবতে বাধ্য হয়-এটাই সংখ্যালঘু সমস্যা। এই সমস্যার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে দেশপ্রেমহীনতা বোধের সৃষ্টি এবং দেশ ত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি। পার্শ্ববর্তী দেশ হিন্দু প্রধান হওয়ার কারণে এদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। তাই দেখা যায়, ১৯৮১ সালে যেখানে হিন্দু জনসংখ্য ছিল ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ১৯৯১-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থাৎ গত এক দশকে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ২ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এক দশক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিন শতাংশের মত। আরো দুই দশক পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে ১৯৬১ হতে ১৯৯১ পর্যন্ত তিন দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই দেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৮ শতাংশেরও বেশি।

এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে একদিন এ দেশ যে হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে সেই সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেয়া যায়? অথচ বিষয়টি এদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ কোন বুদ্ধিজীবি, সমাজসেবী-কেউই গভীরভাবে ভাবছেন না। তাই আমরা মনে করি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বড় সমস্যা অস্তিত্বের সমস্যা-এদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

সুগন্ধা ঃ সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান কি?

কার্তিক-গনেশ ঃ সংখ্যালঘু সমস্যাটি তার অস্তিত্বের সাথে প্রবাহমান। যতক্ষণ একটি দেশে 'সংখ্যালঘুর' অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাটিও বর্তমান থাকে। সংখ্যালঘু সমস্যার মূল হচ্ছে আস্থাহীনতা এবং অবিশ্বাস ও তৎজাত ক্ষোভ হতাশা। বাংলাদেশের সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে এখানকার সংখ্যালঘু সমস্যার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। একটা উদাহরণ দেই। শত্রু সম্পত্তি আইন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী একনায়ক আয়ুব খান এই আইনটি প্রবর্তন করেছিল। সারা পাকিস্তান আমল জুড়ে এই আইনের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ফলে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করেছে। '৭১-এর পরে এদেশের হিন্দুরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশা করেছিল এবার এ আইনের অবসান হবে। হয় নাই। আওয়ামী লীগ সরকার আয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত এই অর্ডিন্যান্সটিকে ১৯৭৪ সালে সংসদীয় আইনে পরিণত করে তাকে আরো জটিল করেছে। আরো কার্যকরী করেছে। এরপর যত সরকার এসেছে কেউ এটা বাতিল করে নাই। সর্বশেষ ১৯৯৬-এ দেশের হিন্দুরা শুধু আশা নয় বিশ্বাস করেছিল এবার শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল হবে। নির্বাচন পূর্ববর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী সকলেই তাদের

www.pathagar.com

বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিগত চার বৎসরেও শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল হয়নি। বরং ভূমি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, এ আইন বাতিল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। এটা কি হতাশা সৃষ্টি করার মত একটি ঘটনা নয়। বস্তুত এ হতাশার মূল অনেক গভীরে। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় চরমমূল্য দিয়েছে। যে এক কোটি লোক সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল তাদের মধ্যে যদি বলি শতকরা নব্বই জন অর্থাৎ নব্বই লাখই ছিল হিন্দু, তবে তা কি অত্যুক্তি হবে। এই এক কোটি মানুষ ১৬ ডিসেম্বরের পর অনেক আশা নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল। তাদের সে আশা কি পূরণ হয়েছে? তারা প্রথম আঘাত পেল তাদের লুণ্ঠিত মালামাল পেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের উদাসীনতা দেখে। সরকার কোন পদক্ষেপই নিলো না। শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল হলো না। পাক বাহিনীর গুড়িয়ে দেওয়া রমনা কালী বাড়ির পুনঃপ্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা সরকার সে জায়গা, হিন্দুরা যাকে পবিত্র পীঠস্থান মনে করে তা অধিকার করে নিলো। এসব ঘটনা হিন্দুদের মনে যে হতাশা-যে ক্ষোভের সৃষ্টি করলো তা আর কমে নাই। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে-এক সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকার এসেছে। কিন্তু এই একদশমাংশেরও বেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য কোন পদক্ষেপ কেউই গ্রহণ করে নাই। তাই বলছিলাম সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই তাদের মনে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এটা নতুন কোন ব্যবস্থা নয়। এটা পাকিস্তান আমলেও ছিল। সংখ্যালঘুদের সরকারি চাকরিতে ২০% কোটা নির্দিষ্ট ছিল। সে ব্যবস্থা চালু করতে হবে। আমরা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বহীনতার কথা বলেছি। জাতীয় সংসদ দেশের সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে যদি একটা সম্প্রদায়ের একটা জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তবে তা তাদের মনে হতাশার সৃষ্টি করবেই। এক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের জন্য জনসংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন করা হয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে। তাদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত আছে। অথচ সরাসরি ভোটে তাদের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে আসার বহু নজীর আছে। তবুও তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। এটা যদি হয় তবে সমাজের দুর্বল অংশ সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণী এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না কেন? মূল কথা হচ্ছে আস্থা ফিরিয়ে আনা। অংশীদারিত্ববোধ সৃষ্টি করা।

সুগন্ধা ঃ আপনারা যে সমস্ত সমাধানের কথা বলছেন আপনারা কি মনে করেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তা পুরণ করবে?

কার্তিক-গনেশ ঃ দেখুন, বিএনপি এসব সমস্যার সমাধানে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে হিন্দু তথা সংখ্যালঘুরা বিএনপিকে কতটুকু সমর্থন করবে তার উপর। পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ভোট পাওয়া না পাওয়া একটা বড় ফ্যাক্টর। সমস্ত রাজনৈতিক দল এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাদের কার্যক্রম গ্রহণ

www.pathagar.com

করে। তবে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এ বিশ্বাস হয়েছে এদেশের হিন্দুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধানে তারা আগ্রহী। এ লক্ষ্যে বিএনপি তার গঠনতন্ত্রের সংশোধনও করেছে। বিএনপি শাসনামলে তারা তপসিলী উপবৃত্তিকে পূর্বের পাঁচ লাখ থেকে বাড়িয়ে বিশ লাখ এবং হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের তিন কোটি টাকাকে ৭ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। তপসিলী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশীকে রেডিও-টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচারের ব্যবস্থাও বিএনপি সরকার করেছিল। এ সমস্ত পদক্ষেপ সংখ্যালঘুদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তাদের সহমর্মিতার প্রকাশ।

সুগন্ধা ঃ আওয়ামী লীগ যদি শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করে তাহলে কি করবেন?

কার্তিক-গনেশ ঃ শত্রু সম্পত্তি আইন যে একটি কালো আইন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। স্বাধীনতার পরে আইনটি বাতিল করা উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি। হবে যে তার কোন আলামতও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে এ আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা উচিত। দলমত নির্বিশেষে সকলের এক্ষেত্রে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। এরকম কোন আন্দোলন হলে আমরা অবশ্যই তাকে সমর্থন করবো।

সুগন্ধা ঃ হিন্দু ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?

কার্তিক-গনেশ ঃ ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুর্নগঠন করেন তখনই তার পাশাপাশি হিন্দু ফাউণ্ডেশন গঠন করা উচিত ছিল। পরবর্তীতে এরশাদ সরকার হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করেন। কিন্তু এ ট্রাষ্টের কার্যক্রম ও তহবিল এতই সীমিত যে তা দিয়ে ইপ্সিত ফলাফল সম্ভব নয়। তাই হিন্দু ফাউণ্ডেশন গঠন ও সে ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে হিন্দুদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের দরকার।

www.pathagar.com

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শহীদ জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

গত ৬ জুন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ২০তম শাহাদতবার্ষিকী। সকাল থেকে গীতা পাঠ এবং বিকাল ৪টায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সহস্রাধিক মানুষের সমাবেশে শহীদ জিয়াউর রহমানের আত্মার সদগতি কামনা সমবেতদের প্রার্থনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হলো অনুষ্ঠানের। শহীদ জিয়াউর রহমানের পত্নী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং মর্যাদা দুই-ই বৃদ্ধি করেছেন।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের এ প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বেগম জিয়ার উপস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায়, এ সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর একাত্মতার প্রকাশ হিসাবেই দেখেছে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হিন্দু নেতৃবৃন্দ-সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপস্থিত হিন্দু নেতৃবৃন্দ-সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বেগম জিয়া তথা বিএনপির যে আত্মিক সেতুবন্ধন বা যোগসূত্র স্থাপিত হলো তাকে ক্রমান্বয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার আশা ও প্রতিশ্রুতি দুই-ই ব্যক্ত করেছেন। বেগম জিয়াও তার বক্তৃতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারে নিশ্চয়তা প্রদানের পাশাপাশি জাতীয় জীবনেও সকল স্তরে তাদের সম-নাগরিকত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ও আশাবাদ ব্যক্ত করে তাদেরকে একাধারে উদীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

তবে বেগম জিয়ার উপস্থিতির কারনে অনুষ্ঠানটি যেমন ব্যাপক প্রচার পেয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানের একজন উদ্যোগতা ছিলাম বিধায় আমিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এসব প্রশ্নের যে সব উত্তর আমি দিয়েছি বা আমার মনে যেসব উত্তর এসেছে তার আলোকেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

নামে না হলেও কার্যত আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিগণিত একটি বহুল পরিচিত হিন্দু সংগঠনের এক নেতা অনুষ্ঠানের দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কার্যালয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন 'জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর বিশ বছর পর হঠাৎ করে তার আত্মার সদ্‌গতি কামনায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে কেন?' বললাম, একটি ভাল কাজ আগে হয়নি বলে আজও হবে না বা ভবিষ্যতেও করা যাবে না এমন তো কোন কথা নেই। ওঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্য ঢাকেশ্বরীতে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? বললাম, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় প্রতি বছর ১৫ আগস্ট যদি এখানে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে তাহলে জিয়াউর রহমানের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠানই বা অযৌক্তিক হবে কেন? প্রশ্নকর্তা এবার একটু রেগে গিয়ে বললেন, "জিয়া আর মুজিবুর রহমান কি এক?' বললাম, না, নিশ্চয়ই এক নয়। একজন সমগ্র জাতিকে পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের মুখে

www.pathagar.com

অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে শত্রু বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর একজন জীবনের নিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমগ্র জাতিকে কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েও দিক-নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান হননি, নিজে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। ভদ্রলোক এবার বেশ রুষ্টভাবেই বললেন, "জিয়াউর রহমানই যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছিলেন রাজাকারদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেছিলেন সেটাকি অস্বীকার করতে পারেন?" বললাম, যা সত্য তাকে অস্বীকার করবো কেন? তবে এ ক্ষেত্রে পিছনের ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকাতে অনুরোধ করবো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্ব পালন করেছিলেন এবং সেই সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মুলনীতির অন্যতম নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল এটাও ঠিক। কিন্তু এই নীতিটিকে কার্যকর বা তাকে জাতীয় জীবনের সকল-স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ ও সদিচ্ছা কি আওয়ামী লীগের আদৌ ছিল? এ সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক জনাব আহমদ ছফা ও গোলাম মোর্শেদ সাহেবের দু'টি মন্তব্য পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। জনাব আহমদ ছফা বলেন, "সিফিউলারিজম" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যদি ধর্মনিরপেক্ষতা ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হবে আওয়ামী লীগ দলটি প্রথম থেকেই ধর্মীয়ভাব বাষ্পের অন্তরাল থেকে জনগণের মন-মানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কর্মসূচিই গ্রহণ করেনি, বরঞ্চ একথা বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধির গোড়ায় আঘাত দেয়ার মত কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা এক রকম অসম্ভবই ছিল।

যুদ্ধের পর নানা সম্প্রদায়ে মিলে মিশে এখানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার যে সুষ্ঠু বিকাশ ক্ষেত্র রচিত হওয়ার কথা ছিল তার সঠিক সুচনাটিও হতে পারেনি। আওয়ামী লীগের শাসনামলে তাই আন্তঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদ রেখাসমূহ না কমে আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে শেখ মুজিবের মনোভাব আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক জনাব গোলাম মোর্শেদ। তার ভাষায়, "পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে যে সংকেত দেখান তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কোনোদিনই ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। তার পরিচয় ইসলামিক না হলেও সে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র।"

তাই রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতির অন্যতম নীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সাংবিধানিকভাবে গ্রহণ করার মাত্র দুই বছরের মধ্যে প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে ইসলামিক রাষ্ট্র সংঘের সদস্য পদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অকার্যকর করে বাংলাদেশকে কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মুলনীতি হিসাবে সাংবিধানিকভাবে বহাল রেখে ইসলাম রাষ্ট্র সংঘের সদস্য হওয়া যে কেবল হাস্যকর ছিল, তা-ই নয়-এটা

www.pathagar.com

অসাংবিধানিকও ছিল। জিয়াউর রহমান এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যই সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছিলেন।

তাই একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, শেখ মুজিব সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কেবলমাত্র এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চোখে ধোঁকা দেয়ার জন্যই। এ ক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতার আফিমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নেশাগ্রস্ত করে রেখে তিনি তাদের চাকুরির কোটা ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন, অনুন্নত অনগ্রসর তফসিলী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছেন। গারো, হাজং, চাকমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, বাগদী প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকভাবে সতন্ত্র জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে তাদের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। এসব ঐতিহাসিক সত্য, একে অস্বীকার করা ইতিহাসকেই অস্বীকার করা।

আর রাজাকারদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের কথা যদি বলতে হয় তবে এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিবই পথিকৃৎ। তিনিই রাজাকারদের বিচারের অতীতের সব প্রতিশ্রুতি, সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর এক ঘোষনায় সমস্ত রাজাকারদের মুক্তির আদেশ দিয়ে তাদেরকে তৃতীয় বিজয় দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইতিহাসের এ সত্যটিকেও কি অস্বীকার করা যাবে?

রাজাকারদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের অভিযোগে যদি জিয়াউর রহমান অভিযুক্ত হন তবে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়ার অভিযোগে কি অভিযুক্ত করা যায় না শেখ মুজিবুর রহমানকে? আর সেই সাথে কেড়ে নেয়া সেই রাজনৈতিক অধিকারকে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কি একটুও ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকার হতে পারেন না শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান?

আলোচনায় এই পর্যায়ে খবর এলো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য বেগম জিয়া তাঁর বাসভবন থেকে রওনা দিয়েছেন। তাই সঙ্গত কারণেই আলোচনা করতে হলো। জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর সকলের সাথে, শেখ মুজিব কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিছু রাজাকারকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেছিলেন-কেবল এটাই দেখা-আর অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে দূরীভূত করে তলাহীন ঝুড়ি হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে অবনমিত ও মর্যাদাহীন অবস্থানে অবস্থিত একটি দেশকে মর্যাদার আসনে বসানোর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা-কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়, এটা এক দেশদর্শিতা। অতপর ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ ২০ বছর পর এসে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শহীদ জিয়ার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এ আয়োজন কেন? প্রশ্নটির উত্তর দিয়েই এ নিবন্ধের শেষ করবো। তবে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আবারও একটু পিছনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগ ভিন্ন অন্য কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। এমনকি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট, এই সাড়ে তিন বছরের শাসন কালে শেখ মুজিব যখন শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করে তাকে

www.pathagar.com

অর্পিত সম্পত্তি নামে নবায়ন করে আরো পাকাপোক্ত করলেন, সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত চাকুরির কোটাকেও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বাতিল করে দিলেন তখনও তারা শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি তারা মনে করেছে, শেখ মুজিবের এসব কার্যক্রম একান্তই সাময়িক। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিপর্যয় কেটে গেলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হলে শেখ মুজিব তাদের সমস্যার দিকে নজর দিবেন, অবসান ঘটাবেন তাদের সকল দুর্দশা, সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাধান হবে তাদের সকল সমস্যার। শেখ মুজিবের প্রতি তাদের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল এতটাই দৃঢ় ও গভীর। শেখ মুজিবের আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার পর তাদের সে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল না হয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে। তারা মনে করেছে শেখ মুজিবের হত্যাই তাদের দুঃখ-দুর্দশা প্রলম্বিত হওয়ার কারণ। তাই দীর্ঘ ২১ বছর ধরে লালন করেছে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করার স্বপ্ন।

এ কারণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এলো তখন এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী ভালোবাসার, আশায়, প্রত্যাশায়, আনন্দে আবেগে আবার উদ্বেল হয়ে উঠলো। এবার আর-আশা নয়-বিশ্বাসও করলো যে, এবার তাদের সকল দুঃখের অবসান হবে। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ তার শাসনামলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। আওয়ামী লীগের এই ৫ বছরের শাসনকালে তার সফলতা ও বিফলতার পাল্লা দু'টির কোনটি কতটা ভারী হয়েছে তা দেখানো এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু এটুকু দেখানো যে অনেক আশা প্রত্যাশা সত্ত্বেও এই পাঁচ বছরে হিন্দু সমাজ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর হতাশা ও আস্থাহীনতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই নিরাশাগ্রস্ত জীবনের কথা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিমচন্দ্র ভৌমিক। তার ভাষায়, "১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে আশা জাগে এবার নিপীড়ন, নির্যাতন বন্ধ হবে, ক্ষোভ হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার অবসান ঘটবে, কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী অবস্থার সার্বিক কোন উন্নতি হয়নি।"

বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের বুলেটিন থেকে দেখা যায় ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২২৩টির মত সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০টি। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে জায়গা জমি জবর-দখল, বাড়িঘরে হামলা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, বিগ্রহ-ভাংচুর এবং চুরি, নারী অপহরণ, লুটপাট ও হত্যা, দেশ ত্যাগের জন্য হুমকি ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে, প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের সাম্প্রদায়িক হামলার সব ঘটনার বিবরণই যে ঐক্য পরিষদের কাছে আসে তা নয়। মূলত ঐক্য পরিষদের শাখাসমূহের পাঠানো প্রতিবেদন থেকেই নির্যাতন-নিপীড়নের ওপর বুলেটিন তৈরি হয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গত ২০০০ থেকে ২০০১ সালের বিগত মাসগুলোতে নির্যাতন নিপীড়নের এই হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

www.pathagar.com

আমি ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি আওয়ামী লীগের ওপর হিন্দুদের বিশ্বাস অনুরক্তি ও ভালোবাসা যেমন-অগাধ তেমনি তার কাছে তাদের প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে আজ যখন অযৌক্তিক ফারাক দেখা দিয়েছে অর্থাৎ প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি যখন হচ্ছে না তখনই হিন্দুদের বিশ্বাসে ধরেছে চিড় মনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা ও ক্ষোভ। সেই হতাশা ও ক্ষোভের ফলশ্রুতিতে আজ যদি তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন বিন্দুতে স্থাপিত হতে চায় তবে তাতে বিস্মিত হলেও বিরূপ বা বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

www.pathagar.com

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের গাত্রদাহ

"সখি কেমনে বাঁধিব হিয়া
আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া"।

জাতীয় সংসদ এবং সংসদের বাইরে বেগম খালেদা জিয়ার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাওয়া নিয়ে প্রধামন্ত্রী বেগম হাসিনা ওয়াজেদ এবং তার কতিপয় সাঙ্গপাঙ্গের বক্তৃতা বিবৃতি শুনে হঠাৎ করেই বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃত পংক্তিটি মনে পড়ে গেল। গত ৬ জুন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রার্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বেগম জিয়ার উপস্থিতি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে তিনি যেসব কথা বলেছেন সেটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সাঙ্গপাঙ্গোদের কেবল গাত্রদাহ নয়, অন্তর্দাহেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অন্তর্জ্বালায় তিনি ৬ জুনের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে দেশনেত্রী বেগম জিয়ার উপস্থিতি নিয়ে যেসব ব্যাঙ্গোক্তি ও বক্রোক্তি করেছেন তার প্রতিক্রিয়ায়ই আমার মনে পড়েছিল বৈষ্ণব কবিতার ওই পংক্তি দু'টি।

কোন হিন্দু সমাবেশে বিশেষ করে জাতীয় মন্দির ঢাকেশ্বরীতে বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতি এবং বাংলাদেশের এক-দশমাংশ জনগোষ্ঠী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সহমর্মিতা ঘোষণা, কোন মতেই শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ মেনে নিতে পারছেন না। বছরের পর বছর ধরে একাধিকক্রমে যে সম্প্রদায় তাদের প্রতি একেবারে নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ আনুগত্য প্রদর্শন করে এসেছে, হঠাৎ করে নির্বাচনের এই প্রাক মুহূর্তে তারা আর কোথাও নয়-একেবারে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের অনুষ্ঠান করে বসবে এবং সে অনুষ্ঠানে বিরোধী দলীয় নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে, এটা মেনে নেয়া শেখ হাসিনা এবং তার দলের পক্ষে আসলেই কষ্টকর। এতদিন ধরে তারা যে সম্প্রদায়টিকে ডোলের ডাল আর খাঁচার মুরগির মত মনে করে এসেছে, আজ তাদের এই আচরণ শেখ হাসিনার কাছে ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি একেবারেই কোন দলীয় অনুষ্ঠান ছিল না। এটা ছিল দল-মত নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক শহীদ জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি অনুষ্ঠান। এ কারণেই শ্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নিমন্ত্রণপত্রে তার দলীয় কোন পরিচয়ের উল্লেখ করেননি। যা হোক আমি অনুষ্ঠানটিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান বলছি এ কারণে যে, অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার জনাব মোর্শেদ সাহেব ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের উপস্থিতিতে তাকে সাক্ষী রেখে বললেন, "১৯৭১ সালে লুট হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরটি সাত বছর যাবৎ বিগ্রহশূন্যই ছিল। ১৯৭৭ সালে এ মন্দিরে

www.pathagar.com

এসে এ তথ্যটি জানার পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন ও মন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমান বিগ্রহটি সেই অনুদানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।" এ তথ্যটি উল্লেখ করে কমিশনার সাহেব মন্দিরের ভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। জনাব মোর্শেদ কর্তৃক এ তথ্য প্রকাশে আমি একাধারে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি। ব্যথিত হয়েছি যে কারণে যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্য ভাগ পর্যন্ত তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের একান্ত আস্থাভাজন রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও '৭১-এ লুণ্ঠিত ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরটির সংস্কার না হওয়ার এবং সেই সাথে মন্দিরে কোন বিগ্রহ না থাকার কথা জেনে। আর বিস্মিত হয়েছি এ জন্য যে, ১৯৭৭ থেকে আজ ২০০১-এর মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ দীর্ঘ পঁচিশ বছরেও জিয়াউর রহমান কর্তৃক মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার তথ্যটি একবারও প্রকাশিত হয়নি দেখে।

এবার মূল আলোচনায় ফিরে যাই। ৬ জুনের এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায় বেগম জিয়াকে নিমন্ত্রণ করেই নিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিকে যেভাবে স্বাগত জানানো এবং সংবর্ধিত করতে হয় ঠিক সেভাবেই তারা তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও লোকাচার দেশাচারের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বেগম জিয়া প্রধান অতিথির ভাষণে যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে তাদের সমনাগরিকত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি ও আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তখন নতুন আশা ও উদ্দীপণায় উদ্দীপ্ত সমবেত নরনারী উল্লাসিত হয়ে উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁর সেই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেছিল-সমগ্র প্রার্থনা সভাটি রূপান্তরিত হয়েছিল এক নবচেতনা ও নতুন প্রেরণার উৎসভূমিতে।

মন্দির চত্বরে সমবেত হিন্দু সম্প্রদায়ের বেগম জিয়ার প্রতি এই উচ্ছসিত ও উল্লাসিত অভিনন্দনই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মর্মবেদনা ও অন্তর্দাহের কারণ। এ কারণেই তিনি বেগম জিয়ার এই প্রার্থনা সভায় উপস্থিতি নিয়ে ব্যাঙ্গোক্তি এবং বক্রোক্তি করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। এসব উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি এমন ভাব প্রকাশ করেছেন, যেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যেয়ে বেগম জিয়া একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন, যেন ঐখানে যাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র শেখ হাসিনার এবং তার দলেরই আছে।

গত বছর জুলাই মাসে খুলনার পাইকগাছা থানার হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বিএনপিতে যোগদান করে তাদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন নিপীড়নের কাহিনী ব্যক্ত করায় বেগম জিয়া যখন সকল প্রকার নির্যাতন-নিপীড়নের মোকাবিলায় তাদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কোন অত্যাচার হলে বিএনপি তা বরদাস্ত করবে না' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখনও বেগম জিয়ার এ বক্তব্য নিয়ে উপহাস, পরিহাস করেছিলেন এবং তাঁর এ আশ্বাসকে সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার অবিচার, নিপীড়ন, নির্যাতন হলে তার মোকাবিলায় তাদের পাশে দাঁড়ানো-তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ-এসবের অধিকার যেন আর কারো নেই–সব অধিকারই যেন তার একারই বিষয়টা যেন এ রকম যে, যত অত্যাচার,

www.pathagar.com

অবিচার, শোষণ নির্যাতনই হোক না কেন, হিন্দু সম্প্রদায় তার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কোন নালিশও জানাতে পারবে না। আর উনি ছাড়া সে নালিশ কেউ শুনতেও পারবেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুশকিল আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ অন্য কোন নেতা-নেত্রী বা দলের কাছে তাদের কোন সমস্যা বা দাবী-দাওয়া নিয়ে আলাপ করলে উনি হবেন ক্ষুব্ধ আর ওঁর কাছে কোন দাবি-দাওয়া বা সমস্যা উত্থাপন করলে উনি হবেন রুষ্ট। তার এই মনোভাবের প্রকাশ কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় নয়, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান মিলিয়ে সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ করেছেন গত ১৯৯৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেয়ে। ওই সাক্ষাৎকারে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালিবাড়ির ধ্বংসস্তুপের উপর একটি মন্দির স্থাপনের দাবি করলে রুষ্ট প্রধানমন্ত্রী এসব দাবি কেবল সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করেননি, উপরন্তু তাদের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে কোন দাবি-দাওয়া জানানোর আগে পুরোপুরি বাঙালী হবার উপদেশ দেন এবং তাদেরকে এক পা ভারতে এক পা বাংলাদেশে রাখা নাগরিক হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ জন্যই বলছি যে, শেখ হাসিনা এ দেশের সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে পেতে চান কেবল নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে কেবল বলতে হবে "সখ্যালঘুদের কোন সমস্যা নেই। তার পাঁচ বছরের শাসনামলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, তারা সুখে আছে, শান্তিতে আছে-স্বস্তিতে আছে, আছে নিরাপদে-নিরুপদ্রবে।"

তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে একেবারেই ভুলে যেতে হবে গত পাঁচ বছরের সকল নির্যাতন-নিপীড়নের দুর্বহ স্মৃতিকে। বিস্মৃত হতে হবে বাগেরহাটের কালিদাস বড়াল আর রংপুরের আলফ্রেড সোরেন হত্যার নির্মম কাহিনী। ভুলে যেতে হবে হাতিয়া দ্বীপের বিষ্ণু প্রিয়ার আহাজারি, নাটোরের দক্ষিণ চৌকিরপাড় এলাকার সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, হবিগঞ্জ চুনারুঘাটের গোবিন্দচন্দ্র দেবকে উচ্ছেদের হুমকি, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুরের সংখ্যালঘু কয়েকটি গ্রামের উচ্ছেদ, চুড়াডাঙ্গার নিশ্চিন্তপুরের ১৮টি হিন্দু পরিবারের উপর নির্যাতনের কাহিনী, সিরাজগঞ্জের চৈত্রহাটি গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, বরিশালের গৌরনদীর সর্ববৃহৎ দুর্গা প্রতিমা ও সিরাজগঞ্জের লক্ষ্মী প্রতিমা ভাংগা, মাদারীপুরের নবগ্রামের হিন্দুদেরকে-ভীতি প্রদর্শন, খুলনার ডুমরিয়ার হিন্দুদের প্রতি নির্লজ্জ অত্যাচার, বাগেরহাটের ১০টি হিন্দু গ্রামের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি, দিনাজপুরের জার্জিস বাহিনীর দেশ ত্যাগ এবং সেই সাথে ১৯৭৪ সালের দুর্গাপূজায় ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অসংখ্য দুর্গামূর্তি ও মণ্ডপ ভাঙগার বেদনাদায়ক স্মৃতিকে।

কিন্তু কিছুসংখ্যক আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাহীন চাটুকারী ভিন্ন কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কি একান্ত বাস্তব ও নিকট অতীতে সংঘটিত এসব নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনী ভুলে যাওয়া সম্ভব?

পরিশেষে 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' এই আপ্ত বাক্যের অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী বেগম শেখ হাসিনার সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে যারা বেগম খালেদা জিয়ার ঢাকেশ্বরীতে যাওয়া নিয়ে উপহাস, পরিহাস ও কটু-কাটব্য করছেন, তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ সংসদ সদস্য শ্রী পঞ্চানন বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলেই এ নিবন্ধের শেষ করবো।

পঞ্চানন বাবু, ১৯৯৬ সালে খুলনা ১ নং নির্বাচন এলাকার উপ-নির্বাচনে আপনাকে মনোনয়ন না দেয়ার অন্যায়-অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক আওয়ামী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপনি মর্যাদাবোধ, মানসিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আপনার সে বিদ্রোহ সেদিন কেবলমাত্র আপনার নির্বাচনী এলাকা নয়, সমগ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকেই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আস্থায় গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল। তারা মনে করেছিল আর না হোক জাতীয় সংসদে অন্তত একটি কণ্ঠ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থের অনুকূলে সদা সোচ্চার থাকবে। আপনি সেদিন হয়ে উঠেছিলেন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের প্রতীক। কিন্তু নিবাচনের পর তে-রাত্তির পেরুতে না পেরুতেই আওয়ামী লীগের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে আপনি তাদেরকে হতাশ করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের শাসনকালের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে-জাতীয় সংসদের আয়ুষ্কালও নিঃশেষ প্রায়। আজ একবার অতীতের পাঁচ বছরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলুন তো, গত পাঁচ বছরে এ দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য কি করেছেন, কতটুকু করতে পেরেছেন?

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউণ্ডেশনে পরিণত করা দূরে থাক, প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্ধও কি বৃদ্ধি করতে পেরেছেন? পেরেছেন কি অনুন্নত অনগ্রসর তফসিলী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বেগম জিয়া কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২০ লাখ টাকার বৃত্তি ব্যবস্থার অর্থকে গত পাঁচ বছরে এক টাকাও বৃদ্ধি করতে? রমনা কালীবাড়ির ধ্বংসস্তুপের দুই-এক শতাংশ জমির উপর ছোট্ট একটি কালমিন্দির নির্মাণেও কি সমর্থ হয়েছেন? আর সর্বশেষে হিন্দুদের আর্থ সামাজিক জীবনের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি নামক আইনটি বাতিলের নামে আজ যেভাবে সম্পূর্ণ আর একটি নতুন আইনের মাধ্যমে, তাদের অপহৃত সম্পত্তির এক ভগ্নাংশ মাত্র ফেরত পাওয়ার পথকেও নানা বাধা-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করার কূটকৌশলকে প্রতিহত করতে পেরেছেন কি?

তাই আপনাদের এসব ব্যর্থতার কারণে আজ যদি হতাশাগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে অন্য কোথা, এবং কোন খানে' আশ্রয় খোঁজে আর অন্য কেউ যদি তাদের কাছে আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বাণী ও সহযোগীতা ও সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে তবে তাকে নিয়ে উপহাস, পরিহাস, কটু-কাটব্য করা কি শোভন হবে?

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়া কেন যেতে পারলেন না বানিয়ারচরে

১৭জুন ২০০১ দিনটি এদেশের গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের মনে একটি কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। সেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারও যে চরম স্বৈরতান্ত্রিক হতে পারে এই উপলব্ধির তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাদের স্মৃতিতে কাটার মতো বিঁধে থাকবে অনেক দিন।

১৭ জুন বিরোধী দলীয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচি অনুযায়ী স্থলপথে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানাধীন বানিয়ারচর হয়ে মঠবাড়িয়া যেতে চেয়েছিলেন। বানিয়ারচর কোন গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা বিখ্যাত কোন গ্রাম নয়। তবে সম্প্রতি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এই গ্রামের প্রায় শতাব্দী প্রাচীন ক্যাথলিক গির্জায় প্রার্থনারত অবস্থায় বোমা হামলায় ১০ জনের মৃত্যু এবং বহুসংখ্যক খ্রিষ্টান সদস্যের আহত হওয়ার ঘটনায় গ্রামটি হঠাৎ করেই দেশব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গেছে। শান্তিপ্রিয় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর ওপর এই বোমা হামলার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বর্বর হামলার নিন্দা এবং সেই সাথে এই হামলার রহস্য উৎঘাটন ও হামলাকারীদের চিহ্নিত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন। দুস্কৃতকারীদের ত্বরিত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক কঠিন শাস্তিদানের দাবিও তিনি উত্থাপন করেছেন। এরপর মঠবাড়িয়া যাওয়ার পথে তিনি বানিয়ারচরে যাত্রাবিরতি করে নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, নিহতদের কবরে যেয়ে তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা, এবং সেই সঙ্গে এলাকার সমস্ত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ব্যথা-বেদনার সাথে একাত্মতা প্রকাশের ইচ্ছা করেছিলেন। বস্তুত কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি মঠবাড়িয়া যাওয়ার জন্য এই পথটি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি-তিনি যেতে পারেননি, তাঁকে যেতে দেয়া হয়নি। কিভাবে কোথায় কোথায় তাকে বাধা দেয়া হয়েছে, কিভাবে বার বার যাত্রাপথ পরিবর্তন করেও কাদের বর্বরোচিত হামলায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় ফিরে আসতে হয়েছে ইতোমধ্যেই তা নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। সুতরাং ওসব বিষয় নিয়ে আমি আপাতত কিছু বলবো না। আমি শুধু এটুকুই বলবো যে, সেদিনের সেই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি কেবলমাত্র সকল রকম ন্যায়-নীতি বর্জিতই ছিল না, ছিল মানবিকতাবোধেরও পরিপন্থী।

সেদিন বানিয়ারচরে বেগম জিয়ার সফর কোন রাজনৈতিক সফর ছিল না। বানিয়ারচরে বেগম জিয়ার কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়ার কথাও ছিল না। দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে একটি শোকাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাতের এটা ছিল তার মানবিক দায়িত্ব বোধ তাড়িত একটি সিদ্ধান্ত। সে দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি বানিয়ারচর যেতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই বানিয়ারচর গির্জার কাছাকাছি অর্থাৎ সমগ্র

www.pathagar.com

জলিরপাড় ইউনিয়নের মধ্যে বেগম জিয়ার আগমন উপলক্ষে কোন স্বাগত তোরণ নির্মাণ করা হয়নি। সমবেত জনতাকে বেগম জিয়ার আগমন মুহূর্তে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস ও উল্লাস ধ্বনি, এমন কি কোন প্রকার স্লোগান দিতেও আমরা নিষেধ করেছিলাম। একটি ফুলের তোড়া দিয়ে দেশনেত্রীকে স্বাগতম জানানোর কর্মসূচিও আমাদের ছিল না। বস্তুত একদল স্বামীহারা, পুত্রহারা, স্বজনহারা, আহত, পঙ্গু শোকাচ্ছন্ন মানুষের কাছে এসব আয়োজন, আড়ম্বরকে আমরা বিসদৃশ্য বলেই মনে করেছিলাম। আমরা শুধু চেয়েছিলাম বেগম জিয়া শোকাভিভূত মানুষগুলোকে সান্ত্বনা দেবেন, দেবেন ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস। কিন্তু এই নিতান্ত মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুযোগটুকুও তাঁকে দেয়া হলো না। এর নাম আওয়ামী শিষ্টাচার ও আওয়ামী গণতন্ত্র!

দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত করার অধিকার একজন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। মতামত প্রকাশের অধিকার, অবাধ যাতায়াতের অধিকার, জনসভা করার অধিকার একজন নাগরিকের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। বেগম খালেদা জিয়াকে বানিয়ারচর গির্জায় যেতে না দিয়ে আওয়ামী লীগ তাঁর সেই মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে।

মঠবাড়িয়া না বলে আমি বার বার বেগম জিয়াকে বানিয়ারচর যেতে দেয়া হয়নি বলছি এ কারণে যে, আমার মনে হয়েছে বেগম জিয়া যদি বানিয়ারচরে যাত্রাবিরতি না করে সরাসরি মঠবাড়িয়া চলে যেতে চাইতেন, তাহলে তার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করা হত গোপালগঞ্জ শহরে বা গোপালগঞ্জের পরে কোথাও। কোন মতেই কেরানীগঞ্জে বা মাদারীপুরে নয়। আমার এ অনুমানের কারণ হচ্ছে, গত ৬ জুন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ২০তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বেগম জিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে যে আত্মিক সেতু বন্ধনের সূচনা এবং তার ভাষণের মধ্যদিয়ে এ সম্প্রদায়ের মনে যে আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন ইতিবাচক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আওয়ামী লীগের নিশ্চিত ভোট ব্যাংক তথা 'ফিক্সড' ডিপোজিটে ভাঙন ধরার আশংকায় দুশ্চিন্তায় শেখ হাসিনাও অস্থির হয়ে উঠেছেন।

জাতীয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে বক্তৃতা বিবৃতিতে তিনি তার এ অস্থিরতা প্রকাশও করেছেন। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের এই অনুষ্ঠানের মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে তিনি যদি বানিয়ারচর গিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্যতম অংশ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ব্যথা-বেদনার শরিক হয়ে তাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে যদি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপির ৩৩.৬১ শতাংশ ভোটের বিপরীতে ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট অর্থাৎ ৪ শতাংশ ভোটেরও কম ভোটে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নৌকা থেকে নেমে যায় তবে আগামী নির্বাচনে যে নৌকার ভরাডুবি হবে, এ অংক বুঝতে আওয়ামী লীগের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সে কারণেই ১৭ জুন বেগম জিয়ার বানিয়ারচর যাওয়াকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছে। কারণ ঐ দিন বানিয়ারচরে কেবলমাত্র জলিরপাড়, কলি গ্রাম, ফুলবাড়ী তথা অত্র এলাকার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ই সমবেত হননি, বেগম জিয়ার আগমন উপলক্ষে সেদিন বানিয়ারচরে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়েছিলেন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলা থেকে আগত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ। এসেছিলেন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান গোষ্ঠীর প্রধান আর্চবিশপ মিঃ ডি রোজারিও। সুতরাং বেগম জিয়া যদি ঐদিন বানিয়ারচর উপস্থিত হতে পারতেন, তবে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁর যে একটি আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যেত, তা ছিল নিশ্চিত।

এ নিবন্ধের শুরুতে আমি বলেছি, বানিয়ারচর গ্রামটি কোন বিখ্যাত গ্রাম নয়। কিন্তু এ গ্রামের গির্জায় ভয়াবহ বোমা হামলায় গ্রামটিকে কেবলমাত্র দেশে নয় বিদেশেও বিশেষ আলোড়ন উদ্বেগ সৃষ্টি করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যেই ক্যাথলিক বিশ্বের প্রধান পোপ পল ভ্যাটিকান থেকে এক বার্তায় এ বর্বর বোমা হামলার নিন্দা করে তার শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বস্তুত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হলেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মোটেই গুরুত্বহীন নয়। তাই এ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বেগম জিয়ার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছাটিকেও আওয়ামী লীগ সমস্ত ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে ন্যক্কারজনক ও চক্ষুলজ্জাহীনভাবে প্রতিহত কচ্ছে। ১৭ জুন বেগম জিয়া বানিয়ারচর যেতে পারেননি, কিন্তু এমনতো নয় যে ভবিষ্যতেও তিনি বানিয়ারচর যেতে পারবেন না। বিরোধী দলীয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অন্যতম সম্প্রদায় খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর শোকাহত পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে সব বাধা উপেক্ষা করে একদিন অবশ্যই বানিয়ারচর যাবেন এবং নিকট ভবিষ্যতেই যাবেন এ আশা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই আমরা করতে পারি। কিন্তু ১৭ জুন তার যাত্রা পথের নানাস্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, তাঁর গাড়ির ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করে তাঁকে তার গন্তব্যস্থলে যেতে না দিয়ে আওয়ামী লীগ যে সন্ত্রাসী ও স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির উলংগ প্রকাশ ঘটালো, এদেশের জনগণ তা-কি সহসাই ভুলে যাবে? বিশেষ করে ১৭ জুনের সেই সকালে প্রবল বর্ষণ আর ঝড়ো হাওয়াকে উপেক্ষা করে বানিয়ারচরের ৫/৭ কিলোমিটার দূর থেকে যে হাজার হাজার মানুষ বেগম জিয়াকে একপলক দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য, গোপালগঞ্জের মাটিতে তাঁর আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য বানিয়ারচরে সমবেত হয়েছিল, একটানা সাত ঘন্টা ধরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষারত সেই মানুষগুলো আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বাধার মুখে বেগম জিয়ার ঢাকা ফিরে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে যে ক্ষোভ, ব্যথা ও ঘৃণা নিয়ে আশাহত চিত্তে বাড়ি ফিরে গেল তারা কি সেটা আগামীকালই ভুলে যাবে? জানি না; আওয়ামী লীগ হয়তো তাই-ই মনে করে।

www.pathagar.com

হাসিনা-অমর্ত্য সেনের ডক্টরেট : কে উত্তম কে অধম

অনেক জল্পনা-কল্পনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট প্রদান করে সান্ত্বনা দান। অমর্ত্য সেন সমগ্র বাঙালি জাতির অহংকার। তিনি বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক হলেও তার পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশেই, এখানেই কেটেছে তার বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলো। তার বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, দাদা ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই রেজিষ্টার। সুতরাং বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে রয়েছে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের নাড়ির যোগ। এ জন্য তাকে বিশেষ সম্মানে সম্মনিত করে ডক্টরেট প্রদান করা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একটি আরোপিত দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকেই গৌরবান্বিত করেছে।

কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও সম্মাননাসূচক ডক্টরেট অফ ল' ডিগ্রি প্রদান করে এই সুন্দর, পবিত্র ও গৌরবময় অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্য, পবিত্রতা ও মর্যাদকেও ক্ষুণ্ন করেছেন। সমগ্র বিষয়টিকে অনেকেই তুলনা করেছেন অচল ছেড়া টাকার নোটকে চকচকে আনকোরা নোটের সাথে মিশিয়ে চালিয়ে দেয়ার ব্যবসায়ী কৌশলের সাথে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অপকৌশলের প্রতিবাদ উঠেছে ছাত্র সমাজের এক বৃহদাংশসহ প্রায় সকল বুদ্দিজীবী মহল থেকেই।

নারীর ক্ষমতায়নই যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট প্রদানের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখিত, সেখানে নারী সমাজেরই অগ্রগামী আলোকিত অংশ-- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হলের মধ্যে তালাবন্ধী করে রেখে এবং একই সাথে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে পুলিশ-বিডিআর দিয়ে অবরুদ্ধ এলাকায় পরিণত করার মধ্য দিয়ে, ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিংশ শতাব্দীর শেষ সমাবর্তন উৎসবের মতো একটি আনন্দমুখর অনুষ্ঠানকে ভয়-ভীতি ও উদ্বেগজনক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করায় দেশবাসী বিস্মিত হয়েছে।

কিন্তু আমি বিস্মিত অন্য কারণে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠের পাশাপাশি গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সে দেশের জনসংখ্যার ১২ শতাংশেরও বেশি হিন্দু এবং বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধও বসবাস করছে, সেদেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। এটা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সমনাগরিক অধিকারের একটি প্রতীকী নির্দশন। পবিত্র কোরআন পাঠের পাশাপাশি গীতা-ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান তথা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যেমন তাদের সম-নাগরিকত্বের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা পায় তেমনি শরিকানা বোধেও উজ্জীবিত হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের দেশে জাতীয় সংসদ রেডিও ও টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে কেবলমাত্র পবিত্র কোরআনই পাঠ করা হয়-আর এর দ্বারা অস্বীকার করা হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই। ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আচ্ছন্ন হয় হীনমন্যতাবোধে। নিজেকে তারা আর সমমর্যাদা ও সম অধিকার সম্পন্ন নাগরিক ভাবতে পারেন না। দীর্ঘদিন ধরে এই নীতি চলে আসায় এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আজ একান্তভাবেই একটি হতাশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তাই হঠাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গীতা, ত্রিপিটক পাঠের খবরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যেমন বিস্মিত হয়েছে তেমনি তাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে যদি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে গীতা-ত্রিপিটক পাঠ হতে পারে তবে জাতীয় সংসদ, রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের শুরুতেই বা তা হতে পারবে না কেন? কেনই বা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তের আলোকে অতঃপর সকল রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে হতে পারবে না এর অনুসরণ? নাকি এটা নিতান্তই একটি সাময়িক ঘটনা। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু বলেই কি তাকে তোষণ এবং ধোকা দেয়ার জন্যই এ ঘটনার অবতারণা?

ধোঁকা দেয়া বললাম এ জন্য যে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গীতাঃ ত্রিপিটক পাঠ করার মধ্য দিয়ে শ্রী অমর্ত্য সেনকে বোঝানো যে, এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্র কোন বৈষম্য প্রদর্শন করে না-করে না কোন বৈষম্যমূলক আচরণ। কিন্তু আসল বাস্তবতা যে তারা নয়, তা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কো-চেয়ারম্যান বোধিপাল মহাথেরো। তার ভাষায়-!গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দল কর্তৃকই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হয়নি, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃকও তারা একইভাবে অবহেলিত হয়েছে, এমনকি সেইসবও ধর্ম নিরপেক্ষ বা যাদের দলের অন্যতম আদর্শ বলে কথিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক যদি কেউ জাতীয় সংসদের সদস্য মনোনয়নের দিনটির প্রতি লক্ষ্য করেন, তবে এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। কারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ দল থেকে জাতীয় সংসদে তাদের মনোনয়ন দেয়া হয় না। এমনকি কোন নির্বাচনী এলাকায় যদি তাদের সংখ্যা শতকরা ৪০ জনের বেশি হয় তবুও না। নির্বাচনের সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক বাধ্য করা হয় তাদের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য। বহু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রার্থী কর্তৃক সংখ্যালঘুদের প্রতি ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করে তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া থেকেও বিরত করা হয়। এভাবে তাদেরকে ভোটাধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কোন বিশেষ প্রার্থী পরাজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগানো ও লুটপাট করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পত্রিকাসমূহের একটা বড় অংশও সাম্প্রদায়িক ভাষণ করে থাকে। সে কারণেই সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাসমূহ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহও এ সমস্ত নির্যাতনের ঘটনাবলী সাধারণ

www.pathagar.com

ডাইরিভুক্ত করা থেকেও বিরত থাকেন রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃকও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণের ফলে আজ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবেই সংসদীয় রাজনীতিসহ অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর বিমূখ হয়ে পড়ছে। এ কারণেই ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন পরিষদে যে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭২ জন, ১৯৭৩ সালে তা নেমে এসে দাঁড়ায় ১২ জনে এবং ১৯৭৯ তে ৮ জন তারপর ১৯৮৮তে এই সংখ্যা ৮ জনেই থেকে যায়। এবং গত ১৯৯১ ও '৯৬ সালের নির্বাচনে তা উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে মাত্র ১১ জন এবং উপজাতিসহ মাত্র ১৪ জনে। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে বিগত বিএনপি এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ আমলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যও লাভ করেননি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা।"

সংখ্যালঘুদের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে তার শাসনকালের সাড়ে তিন বছর অতিক্রম করেছে। এই সাড়ে তিন বছরে বিগত ২১ বছর ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা স্বপ্ন দেখেছিলো যে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি বলে কথিত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তাদের প্রতি অবিচার-অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান হবে-তারা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে, তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। তাদের সামনে আজ শুধু হতাশা ও অবিশ্বাসের নিঃছিদ্র অন্ধকার।

জানি না শ্রী অমর্ত্য সেনের সামনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গীতা-ত্রিপিটক পাঠ করার মধ্য দিয়ে এদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের অবমাননাকর চিত্রকে বিশ্ব বিখ্যাত মানবতাবাদী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিকে কত দূর বিভ্রান্ত করা গেছে, জানি না শ্রী অমর্ত্য সেন শত শত ছাত্রীকে হলে বন্দি রেখে-হাজার হাজার ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে প্রবেশ করতে না দিয়ে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একই মঞ্চে উপবেশন করে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণে কতটা তৃপ্ত হয়েছেন।

তবে এ সমাবর্তন নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে একই মঞ্চে বসে একই সাথে ডক্টরেট গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি শ্রী অমর্ত্য সেনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

❑

পারিবারিক গ্রন্থাগার
আমবাগান [illegible] মুজাহিদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুস্তাহিদ

www.pathagar.com